অচিন্ত্যেশ ঘোষ

একালের চোখে

একালের চোখে

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

॥ মিত্রালয় ॥
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ তিন টাকা ॥

॥ প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৬৪ ॥

মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।
নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

সেকালের মানুষ

তবু, একালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যাঁর সহজ সাযুজ্য

আমাকে বিস্মিত করে

মা-কে

এবং একালের

ভাবনার জগতে আমার প্রবেশ প্রচেষ্টায় প্রধান

সহায়, অগ্রজ

শান্তিজীবন ঘোষ-কে

॥ লৌকিক ॥

॥ অলৌকিক ॥

॥ প্রাসঙ্গিক ॥

লেখাটা যেন একটা অপরাধ, তাই এ দেশে (বুঝিবা বিদেশেও) শুধু লিখলেই অব্যাহতি নেই ; কেন লিখেছি সে-জবাবদিহি আবশ্যক। যেহেতু লেখক হিসেবে এভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে কোনক্রমেই রাজী নই, অতএব, উপস্থিত গ্রন্থটি এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় উপলব্ধির ফলস্বরূপ—এই উক্তির অতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তারে আপাতত বিরত থাকাই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করতে ভাল লাগছে যে 'সমকালীন' সম্পাদক আনন্দ-গোপাল সেনগুপ্ত'র ক্রমাগত তাগাদায় বিব্রত না হলে এই গ্রন্থের অধিকাংশ নিবন্ধ সম্ভবত আমি লিখে উঠতে পারতাম না। তা'ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী এবং বিনয় ঘোষ লেখার ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত না করলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি সাহসী হ'তাম না। সুলেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমান সুব্রতেশ ঘোষের কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী।

এই গ্রন্থের সব ক'টি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে 'গাঙ্গেয়', 'সমকালীন', 'চতুষ্কোণ', 'উত্তরসূরী', প্রভৃতি কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ; তবে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

যাদবপুর,
২১শে আশ্বিন, ১৮৭৯ শকাব্দ

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

মুদ্রণ-শুদ্ধি

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৪	পাশোবর্ত্তীর্ণ	পাশবোত্তীর্ণ
১০	১৫	Culturc	Culture
১৫	(প্রবন্ধের নাম)	একান্নবতী	একান্নবর্ত্তী
২৪	৪	পেশোয়ারী	পেশোয়ায়ী
২৬	৫, ৮, ২১	Westermark	Westermarck
৪৭	৪	"চলো নিয়ম মত"	"চলো নিয়ম মতে"
৫০	২৫	সার্বজনবিদিত	সর্বজনবিদিত
৫২	১২	দে	দেবী
৫৯	১৮	ধর্ম অবশ্য	ধর্ম। অবশ্য
৬৯	২২	তাই	তবু
৮০	১৩	কিন্তু (সে ক্ষেত্রেও	(কিন্তু সেক্ষেত্রেও
৯৭	৪	স্বরূপ	সরূপ
১০৫	৭	শব্দের আদিম অর্থ	শব্দের সমন্বয়ে। 'ফল' শব্দের আদিম অর্থ
১১২	৭	ঐতিহ্যবাহী।	ঐতিহ্যবাহী।৬
১১২	২০		ইংরাজী উদ্ধৃতিটি (৬) নং ফুটনোট হবে।

লৌকিক

ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি

জনশ্রুতি অনুসারে মানুষের ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার নিরন্তর টানাপোড়েনে মানবচিত্ত আবহমানকাল পীড়িত। উভয়ের এই দ্বি-ধা প্রাধান্যদাবিতে মানুষ চিরবিচলিত, এবং আজও তার সংঘাতের শেষ নেই—এ প্রবাদ আজ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে পড়েছে। অন্তর্লোকের এই সংঘাতে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্নেই নাকি বহির্জগতেও সমগ্র মানবজাতি আজ মারাত্মক মতদ্বৈততায় বিভক্ত। তথাকথিত এই মতদ্বৈততার ফলেই হোক অথবা শ্রেণীগত বৈষয়িক স্বার্থসংঘাতেই হোক সমগ্র মানবসমাজ যে সর্বনাশা বিভেদে রণোন্মুখ এ তথ্য অন্ধেরও অজ্ঞাত নয়। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রচলিত যে তাদের মতবাদে ব্যক্তিসত্তার দাবি চূড়ান্তভাবে অবহেলিত এবং তাদের বিশ্বাস, সমাজ-স্বার্থের জাঁতাকলে ব্যক্তিসত্তা নিঃশেষে নিষ্পেষিত না করলে শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি তথা মানুষের সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা নির্দ্ধারণে আমরা আপাতত প্রয়াসী নই। রাজনৈতিক জগতের এই মতদ্বৈততার ব্যাপ্তি বর্তমান সমাজমানসে যত সর্বগ্রাসীই হোক আমাদের আলোচ্য বিষয় নিছক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব। আপাতত তাই আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়েই আলোচনা করব।

প্রথমত, ব্যক্তি এবং সমাজের যে সংঘাত কল্পনা করা হয় তার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করা চলে। ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধের যে ধারণা বিদ্যমান, তার সূত্রপাত ফ্রয়েড করেছিলেন, এ কথা ঠিক নয়; কিন্তু এই ধারণা বিশেষভাবে প্রচলিত হবার মূলে যে তিনি সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃত্তির (instinct) সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধের এবং সামগ্রিক-ভাবে সমাজ-সংগঠনেরই মৌলিক বিরোধ বর্তমান। জৈবিক বৃত্তিগুলিকে নিরন্তর অবদমন করেই মানুষ তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখে। অতএব মানুষের সমাজ-জীবন এবং সভ্যতা ব্যক্তির স্বভাবের বিরোধী। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আপাতত অপ্রয়োজনীয়[১], কিন্তু ফ্রয়েডীয় ভাবধারা ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধের যে অলীক ধারণার সৃষ্টি করেছে তা' আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

ফ্রয়েডের গবেষণা তাঁর ক্লিনিকের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। তাঁর গবেষণা উপেক্ষা না করেও বলব যে, কয়েকটি অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সূত্র ধরে সমস্ত মানবজাতির স্বভাবনির্ণয় যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাই ফ্রয়েডের মতবাদের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে রাজী নন।[২] তা' ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের বৈপরীত্য কল্পনা করতে গেলে আগে ধরে নিতে হয় যে তাদের অস্তিত্ব পৃথক। কিন্তু তা' নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কোন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি সমাজ-বহির্ভূত মানুষেরও মনুষ্য-জীবন অসম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ সমাজ-বহির্ভূত (feral) যে কয়টি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা যাক। আমাদের দেশে মেদিনীপুর জিলায় পাওয়া নেকড়ে শিশু কমলার কথা অনেকেই শুনেছেন। ১৯২০ সালে কমলা এবং অন্য

---

(১) ব্যক্তির স্বরূপ অনুসন্ধানের সূত্রে T. M. Newcomb তাঁর 'Social Psychology' (Dryden Press, New York, 1954—Chap. 10 to 12) গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় মতবাদের খণ্ডনে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন।

(২) "The Freudians have not developed systematic theory of personality types but have contended themselves with special hypothesis based on clinical evidence" (Edward Sapir,—'Encyclopaedia of Social Sciences'—Personality).

একটি শিশুকে (অমলা) শিকারীরা নেকড়ে বাঘের আস্তানায় আবিষ্কার করেন। কমলার বয়স তখন আট এবং অপরটির প্রায় ছুই। অপর শিশুটি অল্প কয়েকমাস পরেই মারা যায়। কমলা ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। শৈশবে এরা নেকড়ে বাঘের কবলে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের স্তন্যেই প্রতিপালিত হয়। ধরা পড়ার সময় আচরণ, খাদ্য এবং অন্য সব ব্যবহারেই এরা নেকড়ে বাঘের স্বভাব পায়। ছুই পায়ে হাঁটা বহুদিন পর্যন্ত কমলার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, কাঁচামাংস ছাড়া অন্য কিছু সে খেত না। নেকড়ে বাঘের মত গর্জন করা ছাড়া অন্য কোন ভাষা তার অজানা ছিল। মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারও নিতান্ত হিংস্র ছিল। অধুনা আগ্রার কাছে আর একটি অনুরূপ নেকড়ে-শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে (২১-৪-১৯৫৭ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। তার ব্যবহারও কমলারই অনুরূপ। হাঙ্গেরীর Kasper Hauser-এর ঘটনাও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। Hauser-এর জন্ম ১৮১২ সালে। হাঙ্গেরীর এক কৃষকের এক অন্ধকার কুঠরীতে তাকে আশৈশব আটক রাখা হয়। কথিত আছে যে বন্দীজীবনে সে কোন মানুষের মুখও দেখেনি। ১৮২৪ সালে সে মুক্তিলাভ করে এবং তাকে ন্যুরেমবার্গে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় সে কোন রকমে টলতে টলতে হাঁটতে পারত, ছুই একটা আধো আধো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে পারত এবং তার মন তখন শৈশবের স্তর উত্তীর্ণ হয়নি। পাঁচ বছর পর তার মৃত্যু ঘটলে তার মস্তিষ্কের পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষায় দেখা যায় যে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রসার একেবারেই ঘটেনি। ছু'জন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, সমাজ থেকে তাকে বঞ্চিত করার ফলে তাকে মনুষ্যত্ব থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে—"The denial of society to Kasper Hauser was a denial to him also of human nature itself"[৩]। সমাজ

(৩) *Cf.* R. M. MacIver and Charles H. Page, "Society", Book one, Part I, Chap. 3, p. 45.

বিজ্ঞানীর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে Hauser জড়পদার্থকে প্রাণী বলে মনে করত। সমাজবিজ্ঞানে অনুমান করা হয় যে আদিমানবও প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য পশুর মত জড় পদার্থকে প্রাণী মনে করত।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সংশ্লিষ্ট শিশুদের অতীত (অথবা ডাক্তারীশাস্ত্রে যাকে বলা হয় history) খুব স্পষ্ট না, তাই এদের সম্বন্ধে গবেষণাও আংশিক বলে অভিযোগ করা চলে। কিন্তু Kingsley Davis যে উদাহরণটি হাজির করেছেন তা' বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে[৪]। Anna নামে পাঁচ বছরের সুন্দর একটি শিশুকে আমেরিকার একটি ছোট শহর থেকে সতের মাইল দূরে এক খামারের দোতালায় পুরনো একটা ভাঙ্গা চেয়ারের সঙ্গে আটকান অবস্থায় Humane Society-র লোকজন গিয়ে আবিষ্কার করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে অবৈধজাত এই হতভাগ্য শিশুটিকে ছয়মাস বয়স থেকে এই অবস্থাতে খামারে এনে আটক রাখা হয়। পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল এবং সেও সুস্থ অবস্থাতেই জন্মায় বলে প্রকাশ। অথচ যখন তাকে পাওয়া যায় তখন তার কোন বোধ বা অভিব্যক্তি ছিল না, বহুকালব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার নড়বার ক্ষমতাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল, কথা বলার এবং চলার ক্ষমতা তো দূরের কথা। পরে তাকে প্রথমত একটি শিশু আবাস, তারপর তার নিজের মা এবং শেষ পর্যন্ত একটি সহানুভূতিশীল পরিবারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে তার মনুষ্যোচিত ক্ষমতা এবং গুণাবলীর বিকাশ হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে কখনই সম্পূর্ণ সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা লাভ করতে পারেনি। ১৯৪২ সালে সে মারা যায়।

---

(৪) *Cf.* Kingsley Davis, "A Case of Extreme Social Isolation of a Child", American Journal of Sociology, Vol. 45, Pp. 554-65, January 1940.

এই সব উদাহরণে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সমাজের বাইরে মানুষের মনুষ্যোচিত জীবন অসম্ভব। সংস্কৃতির মাধ্যমেই সমাজে মানুষ 'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠে। সংস্কৃতির অধিকারেই পাশোবত্তীর্ণ জগতে মানুষের স্থান। প্রসঙ্গত, 'সংস্কৃতি' বলতে আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

'সংস্কৃতি' বলতে সাধারণ লোকে যা' বোঝে তার বিশদ প্রকাশ 'চিৎপ্রকর্ষ' শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে (শব্দটির জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেবের কাছে ঋণী), কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে যাই হোক সমাজতত্ত্বে 'সংস্কৃতি' বা culture শব্দটির অর্থ বহুলাংশে ব্যাপকতর। 'সংস্কৃতি' বলতে মানুষের ঐতিহ্যলব্ধ সামাজিক উত্তরাধিকারের সামগ্রিক সমষ্টিই বোঝায়, 'চিৎপ্রকর্ষ' যার বিশেষ অংশ মাত্র[৫]। সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোঝায় "মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ, অর্থাৎ যা' আমরা জেনেছি এবং যা' আমরা করেছি", তার সামগ্রিক পরিচয়। মানুষের এই মোট সৃষ্টিসম্পদের মোটা অংশই হ'ল পার্থিব সৃষ্টি-সম্পদ (material culture), যা' চিৎপ্রকর্ষের সংজ্ঞায় স্থান পায় না। সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের সূচনা থেকেই 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞায় এই সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমাজতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ E. B. Tylor[৬] থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী Rulph Linton[৭] পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃতির

(৫) UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত Michael Leiris-এর "Race and Culture" 1951, (পৃ—২০।২১) দ্রষ্টব্য।

(৬) "Culture' is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired by man as a member of society"—'Primitive Culture', p. 1.

(৭) "A configuration of learned behaviour and results of behaviour whose component elements are shared and transmitted by the members of a particular society." (M. Leiris কর্তৃক 'Race and Culture', পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

সংজ্ঞায় যে কয়টি দিকের উপর জোর দিয়েছেন তা' হ'ল (১) সামাজিক সূত্রে আহৃত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা, (২) সামগ্রিকতা, এবং (৩) ঐতিহ্য বা সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage)। সমস্ত সংজ্ঞাতেই সামগ্রিকতা ছাড়া, এমন কি সামগ্রিকতার চেয়েও বেশী, যে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে তা' হ'ল সামাজিক সূত্রে আহৃত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা। এই সূত্রেই মানুষ, 'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠে। ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত জীবন মানুষ সামাজিক অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ করে। এই ভাবেই সংস্কৃতি মানুষকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতির সামগ্রিকতার ফলে সংস্কৃতি ব্যক্তিকে শুধু সরাসরিভাবে নয়, সমস্ত সমাজকেও নিয়ত পরিবর্তিত করে' ব্যক্তির উপর আবার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতির এই গতিময় (dynamic) এবং সৃষ্টিশীল ভূমিকাকে উপেক্ষা করলে 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে ধারণা আংশিক হয়ে পড়ে। চিৎপ্রকর্ষের মধ্যে এই গতিময়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ শুধু এই সংস্কৃতির জোরেই। সংস্কৃতি না থাকলে, মানুষের অন্য এমন কোন গুণ নেই যা' কোন না কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সংস্কৃতির বলেই আজ মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, জীবনসংগ্রামে কল্পনাতীতভাবে অন্য সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন উঠবে, যে-সংস্কৃতির জোরে মানুষ পশুত্বের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তা' এত যুগেও কোন না কোন প্রাণীর অনায়ত্ব রইল কেন? এর কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তির মধ্যে আবার একটি বিশেষ ধরনের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটেছিল, (পশুর চিন্তাশক্তি বা বিচারবোধ নেই, এ ধারণা ভুল) তা' হ'ল বিমূর্ত (abstract) চিন্তার ক্ষমতা। এই বিমূর্ত চিন্তাশক্তির বলেই প্রতীক কল্পনা সাধ্য হ'ল, যার ফলে এক-দিকে ভাষা এবং অন্যদিকে হাতিয়ার (tools) সৃষ্টি করা তার

পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বস্তুত, মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিই হ'ল ভাষা এবং হাতিয়ার এবং এই দুটি সম্পদের অভাবে পশু কোনদিনই মানুষের নাগাল পাবে না।

মানুষের জীবনে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত কিনা সন্দেহ। সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতা ভাষার প্রতীকে মানুষের কাছে লভ্য হয়েছে। ভাষা মানুষের সামাজিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক সঞ্চয়কে মূর্ত করে, এবং মানুষ তারই ভিত্তিতে নিজের জীবনকে সংগঠিত করে। ভাষার অভাবে পশুর শিক্ষা অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা চালান হয়েছে। তার মধ্যে Kellog দম্পতির গবেষণা উল্লেখ-যোগ্য[৮]। তাঁরা সাড়ে সাত মাসের একটি শিম্পাঞ্জি শিশুকে (নাম রেখেছেন, Gua) তাদের দশমাস বয়স্ক শিশুপুত্র Donald-এর সঙ্গে একত্রে একইভাবে প্রতিপালন করেন। প্রথম প্রথম কতকগুলি বিষয় Gua, Donald-এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করে, (তার কারণ, হয়ত, সাড়ে সাত মাসের সিম্পাঞ্জি দশ মাসের মানব শিশুর চেয়ে দৈহিক ও মানসিক গঠনে বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কিন্তু দুই বছরের মধ্যে Donald, Guaকে সব ব্যাপারেই ছাড়িয়ে যায়। ভাষা আয়ত্ব করার পর থেকে Guaকে Donald শিক্ষার প্রতিযোগিতায় একেবারেই পরাভূত করে। কিছু কিছু কথা বুঝতে পারলেও Gua স্বভাবতই ভাষা আয়ত্ব করতে পারেনি। Kelloggদের গবেষণা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে শুধুমাত্র সুযোগের অভাব পশুদের পশ্চাৎবর্তীতার কারণ নয়।

এবার দেখা যাক, কিভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। (বলা-বাহুল্য ব্যক্তিত্ব বলতে শুধু দৈহিক অস্তিত্বই বোঝায় না, ব্যক্তিত্বের

---

(৮) Cf. Mr. & Mrs. W. N. Kellog, "The Ape and the Child", N. Y. 1933.

সংজ্ঞায় সামাজিক বৈশিষ্ট্যই মুখ্য।[১] সদ্যোজাত শিশুর কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না, তার ব্যক্তিত্ব সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়)।

সমাজে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা (role) থাকে। কোন কোন ভূমিকা অনিবার্য; যেমন বয়স বা লিঙ্গ অনুসারে যে ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়, ব্যক্তির ইচ্ছায় তার রদ বদল অসম্ভব (আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যে সব অঘটন ঘটিয়েছে তা আমাদের আলোচনায় গণ্য নয়)। আবার কর্ম-সংস্থান অনুযায়ী ব্যক্তি যে-ভূমিকা লাভ করে তা' পরিবর্তনসাধ্য। ভূমিকা নির্দিষ্ট হবার পর আবার সেই ভূমিকাসম্মত আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তার ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করে তোলে। বালিকা যখন নারীত্বে পদার্পন করে তখন তার পরিবর্তন শুধু দৈহিক নয়; এবং তার মানসিক এবং ব্যবহারিক রূপান্তর নারী সম্পর্কে সমাজে যে ধারণা প্রচলিত তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঘটে। অথবা যেমন, সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পর যে-কোন ব্যক্তি ক্রমশ সৈনিকের বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ব করে ফেলে। যাই হোক, ব্যক্তির উপর সামাজিক পরিবেশের এই প্রতিফলন অনিবার্য (অবশ্য এই প্রতিফলন আবার সকলের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে না, বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব না)।

নির্দিষ্ট ভূমিকায় ব্যক্তিকে আবার তার প্রতিবেশী অন্যান্য ব্যক্তির ভূমিকার সঙ্গে আত্মভূমিকার সামঞ্জস্যসাধন করতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশু শেখে তার কোন্ ব্যবহার অন্যান্যের অনুমোদিত এবং কোন্ ব্যবহার অন্যান্যকে তার প্রতি বিরূপ করে

---

(১) "Personality represents a *unique* organisation of persistent, dynamic and *social* predispositions" (T. M. Newcomb, 'Social Psychology', p. 341).

তুলবে। সম্বন্ধের এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই তার ব্যক্তিত্ব রূপ নিতে থাকে ; এইভাবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই সে নিজেকে চেনে, এবং সেই চেনার আলোকেই সে অন্যকেও চেনে। এইভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় সমাজকর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত হয় (এই সামাজিক পূর্বনির্ধারন যে সব ব্যক্তিকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজে না তার কারণ এই পূর্ব-নির্ধারনও আবার বিভিন্ন পার্থক্যে—যেমন বংশগত এবং অন্যান্য পরিবেশ অনুযায়ী—জটিল)।

বিভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার এবং মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণত বাঙালী মেয়েরা লজ্জা-শীলা হয়, কারণ এতদিন পর্যন্ত বাঙালীসমাজে মেয়েদের লজ্জা-শীলতা বিশেষ গুণ বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং মেয়েদের ঘরের বাইরে আসার প্রয়োজনীয়তা বা সামাজিক সমর্থন ছিল না। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মদেশীয় মেয়েরা বাঙালী মেয়েদের চেয়ে বেশি নিঃসঙ্কোচ এবং তারা অযথা লজ্জাকে প্রশ্রয় দেয় না, কারণ তাদের সমাজে মেয়েরা বাইরের কাজে অভ্যস্ত।

সংস্কৃতি কিভাবে মানুষের স্বভাবকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে, তা' Ruth Benedict কয়েকটি উপজাতি (যেমন Zuni, Kwakiutl, Dabu এবং Pueblo প্রভৃতি) সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে দেখিয়েছেন।[১০] বিভিন্ন আদিম মানবগোষ্ঠির সমাজ পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণাসূত্রেই সমাজ-বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের বিকাশে সংস্কৃতির অপরিহার্য ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে Emile Durkheim-এর সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে গ্রাহ্য বলে সমাজতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন। Durkheim তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'De la Division du Travail

(১০) Cf. 'Patterns of Culture'.

Social' (ইংরেজী অনুবাদ করেছেন G. Simpson—'The Division of Labour in Society' New York, 1933)—এর মধ্যে অনবদ্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যে-সব সমাজ অনগ্রসর (যেমন আদিম উপজাতিগণ), যাদের বৈষয়িক কর্ম-বণ্টন (divison of labour) যত প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থিত তাদের সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo) এবং আচার-ব্যবহার তত কঠোর এবং সেই সব সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ তত সীমাবদ্ধ। সেই তুলনায় যে-সব সভ্যতর সমাজগুলিতে বৈষয়িক কর্মবণ্টন যত বিস্তৃত এবং জটিল সেই সব সমাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ তত বেশি। পরবর্তী বিভিন্ন সমাজতাত্বিক গবেষণায় Durkheim-এর সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বিরোধ-নির্দেশী ফ্রয়েডীয় মতবাদ তাই অচল। Ruth Benedict সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন—

"In reality, society and individual are not antagonists. His culture provides the raw material of which the individual makes his life. If it is meagre, the individual suffers ; if it is rich the individual has the chance to rise to his opportunity." ('Patterns of Culture', Chap. VIII)

লক্ষ্য করতে হবে যে Benedict শুধু ব্যক্তি ও সমাজের তথাকথিত বিরোধকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি[১১]। তিনি ব্যক্তির

---

(১১) এই বিরোধকল্পনার মূলে উনবিংশ শতাব্দির দ্বৈতবাদকে Benedict দায়ী করেছেন—

"One of the most misleading misconceptions due to this nineteenth century dualism was the idea that what was subtracted from the society was added to the individual and what was subtracted from the individual was added to society. Philosophies of freedom, political creed of laissez faire, revolutions that have unseated dynasties have been built on this dualism. The quarrel in Anthropological theory between the importance of culture pattern and of the individual is only a small ripple from this fundamental conception of the nature of society. (Patterns of Culture, Chap. VIII)

বিকাশে সংস্কৃতির (তথা সমাজের) ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সংস্কৃতি মানুষকে যে রসদ (raw materials) জোগায় তার উপর ভিত্তি করেই মানুষ তার সমগ্র জীবন গড়ে তোলে। সংস্কৃতি যত অনুন্নত থাকবে, মানুষের ব্যক্তিত্ব ততই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এই মতের সঙ্গে Durkheim-এর মতের কোন অসামঞ্জস্য নেই। বলা বাহুল্য, culture বলতে Benedict 'material culture'-কে বাদ দেননি।

অবশ্য ব্যক্তি ও সমাজের কোন মৌলিক বিরোধ নেই বলে এমন ধারণা হওয়া উচিত না যে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের বিরোধ অসম্ভব। বিশেষত যে সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি (institutions) ব্যক্তিকে তার অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে অশক্ত হয়ে পড়ে সেই সমাজে ব্যক্তি-চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিপ্লবমুখী অস্থির সমাজেই এই পরিস্থিতি দেখা দেয়। স্থৈতিক (static) সমাজে ব্যক্তিচেতনা একান্তভাবেই সমাজ-চেতনার সঙ্গে মিশে থাকে।

ব্যক্তিচেতনা এবং আত্মচেতনা সমার্থক নয়। পশুত্বের স্তর থেকে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মচেতনা এবং আত্ম-জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটেছে, কিন্তু ব্যক্তিচেতনা তথা ব্যক্তিবাদের সূত্রপাত নিতান্তই আধুনিক। বস্তুত ব্যক্তিবাদ বা ইংরাজী Individualism উনবিংশ শতাব্দিতেই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। Individualism কথাটি ফরাসীভাষা থেকে ধার করা। ফরাসীতে কথাটি ব্যবহার করেন De Toqueville তাঁর "De la De´mocratic on Amerique" গ্রন্থে (1840)। Henry Reeve তার ইংরাজী অনুবাদ করার সময় 'Individualism' কথাটিকে ইংরাজীতে আমদানী করেন[১২]। ব্যক্তিবাদ বলতে

(১২) Cf. M. Ginsberg, 'On the Diversity of Morals', Part II, Chapter IX. P. 150.

De Toqueville বুঝিয়েছেন এমন এক মনোভাব যা' প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছ থেকে সরিয়ে আনে,—সমাজের যা' ঘটে ঘটুক। ("An attitude of mind which leads each member of the community to 'draw' apart from his fellow creatures and to leave society at large to itself".)।

এই ধরনের মনোভাব প্রাচীন মানবসমাজে দেখা যায়নি। তা' সম্ভবও ছিল না। অধিকাংশ আদিম সমাজেই মানুষের জীবন টোটেমের[১৩] অনুশাসনে ওতঃপ্রোতভাবে বদ্ধ ছিল। টোটেমের আওতায় ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের কোন প্রশ্নই নেই। টোটেম-গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের একমাত্র, সমাজসত্তারই রকমফের, এক ধরণের গোষ্ঠিসত্তা ('Tribal self') বিদ্যমান ছিল। বস্তুত বর্তমান জগতে মানুষের প্রকৃতি আর আদিম মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য অপরিসীম[১৪]। ব্যক্তিচেতনার উন্মেষ হয়েছে প্রথমত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রপাত থেকে এবং তা' সভ্যতার অনেক পরবর্তী স্তর। বর্তমান যুগে যে-ব্যক্তিবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সূত্রপাত ঘটে ইউরোপে, প্রধানত তিনটি ধারায়,

---

(১৩) পশু, পাখী, বৃক্ষ বা অন্য কোন বস্তুকে আত্মীয়তাবন্ধনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে' সেই সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত মানবগোষ্ঠী আমাদের চোখে পড়ে। সেই আত্মীয়তা-বন্ধনকে বা ঐ-সব প্রতীককে সমাজবিজ্ঞানীরা Totem আখ্যা দিয়েছেন। Totem সম্বন্ধে সমাজতত্ত্বে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে R. Briffault-এর "Mothers" গ্রন্থের Chapter XVIII (Book II)-এর the Totem শীর্ষক পরিচ্ছদটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

(১৪) "Primitive human nature differed considerably, and in some respects radically, from what we are prone to assume to be 'human nature' in general......one of the most startling and fundamental differences between the mentality of the primitive humanity and the current conception of human nature, is the degree, almost inconcievable to us, in which the sentiment of individuality is undeveloped in the primitive mind. (R. Briffault, "Mothers" Chapter XVIII)

১। খৃষ্টীয় ধর্ম মতে ব্যক্তির স্বীকৃতি, যা' বিশেষভাবে রিফর্মেশনের যুগ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (যদিও একথা ইউরোপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য তবু মনে রাখতে হবে যে বর্তমান ব্যক্তিবাদ ইউরোপ থেকেই সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে)। ২। রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগে যন্ত্র সভ্যতার সূত্রপাত এবং ব্যক্তির অর্থনৈতিক মুক্তি, এবং ৩। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি। পদার্থ-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে, অন্যান্য বিজ্ঞানে এবং বিশেষত সমাজবিজ্ঞানেও পদার্থবিজ্ঞানের মাত্রিক বিচার পদ্ধতির (quantitative methods) প্রচলন শুরু হয়। ফলে সমাজের প্রাথমিক মাত্রা (unit) হিসেবে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে চলে[১৫]। এই সূত্রপাত থেকে laisses faire মতবাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদের যে পুষ্টি তারই পরিণতি বর্তমান ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের পক্ষ-পুটে লালিত উগ্র ব্যক্তিসর্বস্বতায়। যে ব্যক্তিবাদের উদ্ভব ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক নাগপাশ থেকে মানুষের মুক্তিলাভ অসম্ভব ছিল, সেই ব্যক্তিবাদই আজ সমাজ প্রগতির ঘাড়ে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অবশ্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক না। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সমতালে অগ্রসর হয় না। বিশেষত বৈষয়িক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ প্রায়শঃই সমান তালে চলতে পারে না। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের এই অসংগতিকে 'সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্বর্তিতা' বা 'Cultural Lag' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৬] আজ তাই একদিকে যখন

(১৫) Cf. A. D. Lindsay—Encyclopaedia of Social sciences—Individualism.

(১৬) 'Cultural lag' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য W. F. Ogburn-এর Social Change গ্রন্থের পৃঃ ২০০-২৬৫ দ্রষ্টব্য। Ogburn-ই ১৯২২ সালে Cultural lag কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানে Cultural Lag-এর উপর আলোচনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সর্বাধুনিক আলোচনার জন্য Sociology and Social Research পত্রিকার Jan.-Feb. 1957 সংখ্যায় Ogburn-এর "Cultural Lag as theory" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে তখন অন্যদিকে তারই সহচর ব্যক্তিবাদ অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলির সঙ্গে সমাজ মানসে ভয়াবহ বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্যক্তি-কৈবল্যের কুজ্ঝটিকার আড়ালে ব্যক্তির সামাজিক পটভূমিকা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফলে বর্তমান সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক সম্বন্ধ বিস্মৃত, ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজস্বার্থের সমার্থকতা বিলুপ্ত। তাই আজ ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার ভিত্তিহীন সমস্যাও এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যে, অপ্রীতিকর হলেও তার গুরুত্ব অস্বীকার করা অন্ধতার পরিচায়ক।

যাই হোক, ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার বর্তমান অসামঞ্জস্যকে চিরন্তন বলে মেনে নেওয়া চলে না ; এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার যে মৌলিক কোন সংঘাত নেই সে বিষয়ে অন্তত সমাজ-বিজ্ঞানে কোন সংশয় নেই।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা

বাঙ্গালীর বর্তমান সমাজ-জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা পারিবারিক সংগঠন—এই প্রস্তাবে মতান্তর ঘটবে কি ?—বোধ হয় না। মতানৈক্য ঘটবে সমস্যার সমাধান নিয়ে, এবং তা' স্বাভাবিক।

একান্নবর্তী পরিবার অনিবার্য বিলুপ্তির মুখে। এটা অনেকের চোখে পড়েছে, অনেকে সে বিষয়ে অচেতন। যাঁরা সচেতন তাঁরাও যেন পরিস্থিতিটাকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। একান্নবর্তী পরিবারের মনোবৃত্তি আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি! বাংলা দেশে এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান (Statistics) নেওয়া হয়েছে কি না, তা' আমাদের চোখে পড়েনি। তবে বোম্বাই প্রদেশে এ বিষয়ে দু'একটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাদের অন্যতম শ্রী কে, টি, মার্চ্চেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান-এর ফলাফল এইরূপ ঃ

শতকরা হার

	গুজরাত	পুণা	বোম্বাই	মোট
একান্নবর্তী পরিবারের সপক্ষে	৫৩·২২	৪১·৩০	৪২·২৪	৪৫·১
„ „ বিপক্ষে	৩৫·৪৮	৪৩·৪৮	৪০·৫৩	৩৯·৭২
মিশ্র পরিবারের পক্ষে	১১·৩০	১৫·২২	১৭·২৩	১৫·১৮
	১০০	১০০	১০০	১০০

(K, T. Merchant—Changing Views on Marriage and Family).

শ্রী কে, এম, কাপাডিয়া এই বিষয়ে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ৩৭২ জন শিক্ষকের মতামত সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জন একান্নবর্তী পরিবার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনার পক্ষপাতী, ১৯২ জন সেই পরিবারভুক্ত থাকার পক্ষে এবং ১১৩ জন

মনস্থির করে উঠতে পারেননি। (K. M. Kapadia—Marriage and Family in India, Chap. XII, P. 252),

বাংলাদেশে অনুরূপ পরিসংখ্যান নিলে ফলাফল একেবারে বিপরীত হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার প্রথার মোহ আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি বা না পারি, এই প্রথা যে ভেঙ্গে পড়ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কি ভাবে এই সনাতন ভারতীয় প্রথা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছে সেই দিকে সামান্য আলোকসম্পাত করা যেতে পারে।

একান্নবর্তী পরিবারের সূত্রপাত বৈদিকযুগেই ঘটেছে তা স্পষ্ট *। সেই ধারা বৃটিশ রাজত্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তবে বৃটিশ শাসন কালেই সেই প্রথায় ফাটল ধরেছে একথাও ঠিক।

> 'The whole history of the Hindu family unfolds one significant fact, viz., that even when the trends towards individulism were recognized and attempts were being made to harmonize them with the interest of the joint family, the family constitution was unequivocally declared to be, and maintained as joint and agnatic."

(K. M. Kapadia—Marrige and family in India p. 219).

বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এক অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তার কারণ প্রধানত দু'টি, ভারতীয় গ্রামগুলির অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা এবং চলাচল ব্যবস্থার দুর্দ্দশা। প্রত্যেক গ্রামেই প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং বস্ত্রসম্ভার উৎপন্ন বা প্রস্তুত হ'ত, তাই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের অর্থনৈতিক প্রয়োজন কখনই তীব্রভাবে দেখা দেয় নাই। অনেকটা এই কারণেই বোধহয় একমাত্র দ্রাবিড় সভ্যতার যুগকে

* A. A. Macdonnel and A. B. Keith—Vedic Index, (1912).

বাদ দিলে ভারতীয় রাস্তাঘাট কখনই খুব উন্নত স্তরে পৌঁছায়নি *। এই প্রসঙ্গে ১৮২৫ সালে মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Public Works Commission-এর রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য—

"......nearly the whole of the made roads (so-called) are only so far made as to be just practicable for carts. They admit of carts moving in dry weathers with light loads at a very slow pace and by very slow stages. But by far the greater portions of these roads are unbridged and a heavy shower cuts off the communications wherever the stream crosses a line ; and they are in many cases so unfit to stand the effects of the wheels while the surface is wet, that in monsoon months they are out of use except for cattle or foot passengers."

ভারতের অন্যান্যস্থানে যে রাস্তাঘাটের অবস্থা উন্নততর ছিল তা' মনে করার কোন কারণ নেই। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন একটা স্থবিরতা এনে দিয়েছিল তেমনি সমাজজীবনেও একটা জড়তার সৃষ্টি করেছিল। মাঝে মাঝে বন্যা, অনাবৃষ্টি এবং তজ্জনিত দুর্ভিক্ষের কবলে পর্যুদস্ত, অসহায়ত্ববোধে আপ্লুত ভারতবাসীর পক্ষে বুঝি কর্মবাদে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না! যেখানে প্রকৃতির কাছে সব ব্যাপারেই মাথা নোয়াতে হয়, সেখানে মাথা নোয়ানোই মজ্জাগত হয়ে পড়ে—সব কিছুই নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। জাতিভেদ প্রথাসহ সমস্ত সামাজিক প্রথাই একেবারে কায়েমী হয়ে সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। সনাতন একান্নবর্তী-পরিবারপ্রথা তাই নিঃসংশয় আনুগত্য লাভ করেছিল।

* দ্রাবিড় সভ্যতায় ভারতীয় নগরে রাস্তাঘাট অত্যন্ত উন্নত ছিল একথা প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার রাস্তাঘাটের উল্লেখ করা যেতে পারে—(Mackay-র Indus Valley Civilization দ্রষ্টব্য)।

বৃটিশ শাসনকালে ডাক ও রেলপথের বিস্তার সর্বপ্রথম গ্রাম্য-সমাজকে বর্হিজগতের সঙ্গে যুক্ত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিল-ফ্যাক্টরীজাত দ্রব্যাদি ক্রমশঃ গ্রামের আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে। সম্প্রসারণশীল নগরগুলির টানে অনেকেই কর্মের সন্ধানে গ্রাম ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারার সংস্পর্শে এদেশের ভাবজীবনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটল।

বৃটিশ উদার-নৈতিক ভাবধারা এদেশীয় একান্নবর্তী-পরিবার প্রথাকে দ্বিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত করেছে। একান্নবর্তী পরিবারে কর্তা বিধাতাস্বরূপ; তার মতের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করাও রীতিবিরুদ্ধ ছিল। উদারনৈতিক মতবাদের অন্যতম অঙ্গ গণতান্ত্রিক বোধ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কর্তার আধিপত্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করল। পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে স্ত্রীজাতিরও আনুপাতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারও অবশ্য এই জন্য যথেষ্ট দায়ী। উদারনৈতিক ভাবধারার আর একটি দিক যুক্তিবাদ। যুক্তির ধোপে টেঁকে না এমন কিছুই আর গ্রাহ্য হতে চায় না। সনাতন ধর্মের দোহাই আর অলঙ্ঘ্য রইল না। অবশ্য পরিবারে স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যই সম্ভবত একান্নবর্তী পরিবার প্রথার উপর সবচেয়ে বড় আঘাত করেছে।

পরিবারের প্রত্যেক জনের সামাজিক নিরাপত্তাই বোধ হয় একান্নবর্তী পরিবারের প্রধান সার্থকতা ছিল। রুগ্ন এবং অশক্তের একান্ত অবলম্বন ছিল এই পরিবারপ্রথা। বর্তমান হাসপাতাল এবং অনুরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই প্রয়োজনীয়তাকে ধীরে ধীরে লাঘব করে দিচ্ছে। আগে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে অসহায় বিধবা এবং শিশুদের আশ্রয় ছিল এই পরিবারপ্রথা। আজকাল জীবন-বীমার প্রসারে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে যথেষ্ট। শ্রাদ্ধাদি পূর্বপুরুষ-পূজার (ancestor worship) পদ্ধতি একান্নবর্তী

পরিবারে একটা বন্ধন আনত। ধর্মের উপর বিশ্বাস শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব আচার অনুষ্ঠানাদিও ধীরে ধীরে বিলীয়মান।

মোটকথা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিপ্লবের সঙ্গে তাল রেখে এই প্রথাটি তার স্বাভাবিক মৃত্যুই লাভ করেছে। এই প্রথা ভাল কি মন্দ সেই বিতর্কে না গিয়েও প্রশ্ন করা চলে, যে প্রথাকে কোন রকমেই আর জিইয়ে রাখা যাবে না মুমূর্ষু ঘোড়ার মত সমাজের আগে তাকে জুড়ে দিলেই কি সমাজ চলবে? না তার চেয়ে নুতন বাহনের সন্ধান শ্রেয়?

বাঙালীর পরিচ্ছদ

কি পরে বেরোবো এই দৈনন্দিন সমস্যায় অল্পবিস্তর সকলেই জড়িত। কিন্তু বর্তমান পরিধান সমস্যার আর একটি দিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা' হ'ল আমাদের পোষাক কি জাতীয় হবে। আমাদের জাতীয় পোষাক কি ধরনের হবে এও একটি প্রশ্ন বটে, তবে সে প্রশ্ন সর্ব-ভারতীয়। আমরা অর্থাৎ শহুরে-বাঙালীরা প্রথমোক্ত সমস্যা নিয়েই বেশী বিব্রত। এই সমস্যাও প্রধানত পুরুষদের পোষাক নিয়ে এবং আপাতত প্রশ্নটি দাঁড়িয়ে গেছে ধুতি বনাম পেণ্টালুনের মধ্যেই।

ধুতি বনাম পেণ্টালুনই আমাদের বর্তমান বস্ত্র-নির্বাচনের ষ্ট্রেট ফাইট। ধুতির সঙ্গে সার্টকে আমরা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি, এমন কি কোট্‌কেও। তাই যে যাই বলুক, প্রশ্নটি ঠিক স্বদেশী বনাম বিদেশী নয়, যদিও প্যাণ্টের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি বোধ হয় এই বৈদেশিকতাতেই।

আমাদের স্বদেশী পোষাক কি? প্রাচীন বাংলার সাজ-সজ্জার সম্বন্ধে ডাঃ নীহার রায় প্রমুখ পণ্ডিতদের মারফৎ যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে তো মনে হয় শার্ট-কোর্ট তো দূরের কথা 'পাঞ্জাবি' জাতীয় জামাও প্রাচীন বাংলায় খুব প্রচলিত ছিল না। সেলাই করা বস্ত্রের কোন পাট ছিল না। সেলাই বিহীন এক-বস্ত্রই আমাদের আদি এবং অকৃত্রিম অধোবাস। উত্তরীয় এবং মেয়েদের ওড়নাও কিছু পরেই আমদানী। বাঙালী মূলতঃ যে নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভব (প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড এবং মঙ্গোলয়েড মিশ্রিত) তাদের ঐতিহ্য দেহের উপরার্ধ খালি রাখা। বলি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে এমন কি ভারতেও মালাবারের নায়ারদের মধ্যে (পল্লী অঞ্চলে) এখনও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দেহের

উপরার্ধ খালি রাখে *। বিদেশীদের বর্ণনাতেও এর ব্যতিক্রম পাই না, অন্তত সর্বসাধারণের পোষাক সম্বন্ধে। সর্বসাধারণের পোষাক শুধু বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষেরই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগের প্রাক্কাল পর্যন্ত বিশেষ বদল হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পাদ্রী আবে ডুবোয়া সাহেবের যে বর্ণনা পাই, তাও এই কথা প্রমাণিত করে (Moeurs, Institutions et Ceremonies des peuples de l'Inde'—ইংরাজী অনুবাদ ও সংকলন করেছেন Henry K. Beauchamp—'Hiudu Manners Customs and Ceremonies,' পৃঃ ৩২৩ দ্রষ্টব্য)। সেলাই করা জামা যে অপরিচিত ছিল তা' মনে করার কোন নেই। প্রাচীন মূর্ত্তি, পট, দেওয়াল-চিত্র ইত্যাদিতে চোলক, কঞ্চুক পরিহিতা মহিলা দুই একটি দেখা যায় বটে। পাজামার আমদানী ভারতবর্ষে কুষানরাজারা করেছেন বলে মনে হয়। মথুরায় কনিষ্কের যে মূর্ত্তি পাওয়া যায় (১ম-২য় শতাব্দীর বলে অনুমিত) তার মধ্যে লম্বা কোট আর পাজামার পরিচয় পাই। এই ধরনের পোষাক মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। সেলাই করা পোষাক বহুল প্রচলিত হতে আরম্ভ হয় মুসলমানদের রাজত্বের সময়। কিন্তু এই বহুলপ্রচলনও সমাজের ওপর তলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে ধুতি ও চাদর (অর্থাৎ উত্তরীয় বা ওড়না ; শীতকালে পশমের ব্যবহার ছিল) চিরদিন বহাল।

তা' বলে ধুতি সমর্থকদের (আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বোম্বাই প্রদেশীয়েরা ব্যঙ্গ করে বলে 'ধোতরদাস'। গুজরাতী বেণে শ্রেণীর ওপরই কথাটা বেশী প্রযুক্ত হয়—ওরা ধুতিটা পরেও যেন কেমন অদ্ভুতভাবে ; তা' ছাড়া ওদের পোযাকে, স্বভাবে, ব্যবহারে

* James Fergusson-এর মতে মুসলিম শাসনকালের আগে হিন্দুমহিলারা খোলা বুকে থাকাটা মোটেই লজ্জাকর বলে মনে করতেন না ('Tree and Serpent Worship', London' 1873, pp102-3).

কেমন একটা গোঁড়া এবং unsmart ভাব আছে, যাতে কথাটা অনেকটা লাগসই মনে হয়) উল্লসিত হবার কিছু নেই। ধুতি ছিল বটে। কিন্তু সে ধুতি এ-ধুতি নয়; বাঙ্গালীর প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। বাংলায় (এবং ভারতের অন্যত্রও) যে ধুতি আদি যুগে প্রচলিত ছিল তা' একান্ত খাটো, হাঁটুর নীচে নামত না। পরার ধরনেও বর্তমানের সঙ্গে কোন মিল নেই। আগে রীতি ছিল 'ধুতি'র (বস্ত্রের) মাঝখানটা কোমরে জড়িয়ে ছুটো খুঁট টেনে পেছনে কচ্ছ বা কাছা দেওয়ার। ঠিক নাভির নীচে ছু'তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টা থাকত কোমরে আটকান। আজকালকার ধুতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোঁচার অস্তিত্ব ছিল না আগে। হালে আবার তরুণরা এক অদ্ভূত কায়দায় মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেন, দেখতে অনেকটা পেশোয়ারী সলওয়ারের মত দেখায়। সাদৃশ্য এইমাত্র যে আগেকার মত বর্তমানেও ধুতি সেলাই-ছাড়া, তা' ছাড়া আগের মত এখনও ধুতি কার্পাসজাত।

তা, সেলাই-এর বিরুদ্ধে তো কোন আপত্তি তো শুনি না! তবে তো শার্ট, পাঞ্জাবি, (মায় গেঞ্জি ইত্যাদি অন্তর্বাস) কিছুই পরা চলবে না। ধোতরদাসরা রাজী হবেন কি? (আগে ভাগে স্বীকার করে রাখি বাঙালীদের চাদরসহ 'ধুতি-পাঞ্জাবি' পরার ধরন অতি শোভন এবং রুচির পরিচায়ক, অবশ্য এই 'ধুতি-পাঞ্জাবি'র স্থবিধা অস্থবিধার প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু যারা ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন, তারা সকলেই গোঁড়া নন। আমাদের 'ধোতরদাস' শব্দটি সেই সনাতনের ধ্বজাধারীদের দিকে ছুঁড়ে মারা হ'ল যাঁরা স্বদেশী-বিদেশী প্রশ্নে একান্তই বেসামাল হয়ে পড়েন)

ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর, অর্থাৎ বর্তমানে বাঙালীর পোষাক বলতে যাকে ধরা হয় তার চল বেশী দিন হয়নি। তার সূত্রপাত আংশিকভাবে জমিদারদের মধ্যে ঘটেছে, এবং তা' বিশেষত বৃটিশ আমলের বাবু-গোষ্ঠীর দ্বারা লালিত। হুতোম প্যাঁচার 'বাবু'-র

সাজসজ্জা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত চালু ছিল বলা যেতে পারে। বাঙালী বিলাসী বাবুদের চেহারা পাল্টাতে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এবং সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। বর্তমানে পরিচ্ছদের বিলাস এবং বিলাসের পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ই পাশ্চাত্যানুগ। জমিদারী প্রথার উৎখাতে হুতোম বর্ণিত বাবু-বেশের যুগান্ত ঘটল বলেই আমাদের অনুমান!

আধুনিককালে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে ধুতির সম্বন্ধে অনাস্থা অনেক দিন থেকেই। অফিসের বাবুরা বছর তিরিশ-চল্লিশ আগে প্যাণ্টের বিকল্পে মালকোছামারা ধুতির নীচে শার্ট গুঁজে দিয়ে তার উপর কোট চাপাতেন। এই ধরনের সজ্জাধারী এখনও ডালহৌসি স্কোয়ারে দেখা যায়। গত বছর পনের কুড়ি ধরে তরুণদের মধ্যে যে 'সলওয়ারী' ধুতির প্রচলন হয়েছে তার উল্লেখ আগেই করেছি। এটা অনেকটা ফ্যাসানে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী এই কারণে যে ধুতি আর আজকালকার জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। আমাদের সমাজের বৈষয়িক বুনিয়াদ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজটাই পালটে যাচ্ছে। সামাজিক রীতি-নীতি ধরন ধারণ সব কিছুই আজ বদলাচ্ছে। সেকালের কৃষক-প্রধান বাঙালী জনসাধারণ (এখনও কৃষকের সংখ্যাই বেশী, তবে আমাদের আলোচনা চলছে প্রধানত নাগরিক বাঙালী ভদ্রলোকদের নিয়ে সেকথা মনে রাখতে হবে) যে খাটো ধুতি পরবে তা' তো স্বাভাবিক, কোঁচা ছুলিয়ে কৃষিকার্য বা অন্য কোন কায়িকশ্রম অসম্ভব। শ্রেণীগত কায়িকশ্রমের বিচ্যুতিই মাটিতে লোটান কোঁচাওয়ালা লম্বা ধুতির প্রচলনের মূলে। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে কায়িক শ্রম যখন থেকে লজ্জাকর বলে পরিগণিত হতে আরম্ভ হ'ল তখন থেকে পোষাকেই মালিকের শ্রমের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রকট করার চেষ্টা চলেছে। ফলে 'হাঁটুর উপর ধুতি' নামতে নামতে মাটিতে লোটাতে আরম্ভ করল, মোটা কাপড় সূক্ষ্ম

হতে হতে মসলিনের পরিণতি নিল (মসলিনের পোষাকে যে কায়িক শ্রম অসাধ্য তা' সকলেই স্বীকার করবেন), কোন কোন স্থানে (যেমন মহারাষ্ট্রে) যেখানে শিরস্ত্রাণের বিশেষ প্রচলনই ছিল না সেখানেও উষ্ণীষ বাড়তে বাড়তে এমন পেশোয়ারী রূপ নিল যা' পরে' চলাফেরাই দুষ্কর মনে হয়। পোষাকের বিবর্তনের সঙ্গে আভিজাত্যের সম্বন্ধ সব দেশেই অত্যন্ত স্পষ্ট। James Laver বলেছেন—

"It is one of the commonplaces of the psychology of clothes that the sense of belonging to a superior caste, of beieg an important person is much assisted by wearing clothes in which it is almost if not quite impossible to do any work" (Clothes, London, 1952).

অতএব লোক-ঠাসা ট্রামে-বাসে চলাফেরার একান্ত অনুপযোগী এবং অফিসের টেবিল-চেয়ার-বাহন কাজে অপ্রয়োজনীয় ধুতির কাল ফুরিয়ে গেছে। কারখানায় তো ধুতি সরাসরি অগ্রাহ্য। খেলা-ধূলাও আমাদের জীবনের আবশ্যক অঙ্গ। ভাল হোক মন্দ হোক সাবেকী খেলাধুলা, যেমন হাডুডু, কপাটি প্রভৃতি খেলা প্রায় উঠে গেছে। অন্তত জনপ্রিয়তায় ফুটবল-ক্রিকেট-হকি-টেনিস-ব্যাডমিণ্টন খেলার সঙ্গে এসব খেলার কোন তুলনা চলে না। উপরোক্ত আধুনিক কোন খেলাই ধুতি পরে খেলা চলে না (জোর করে না চালালে), এবং কার্যত এসব খেলায় আজকাল ধুতির প্রচলন উঠেই গেছে। স্কুল কলেজেও ধুতির ব্যবহার দ্রুত কমে যাচ্ছে। আধুনিক স্কুলগুলিতে ইউনিফর্মের প্রচলন খুব বেড়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য কোন্ স্কুলেই ধুতি ইউনিফর্ম নয়। পোষাকের পরিণতি কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে যদি ট্রাম-বাস-টেবিল-চেয়ার-অফিস-কারখানা-স্কুল-কলেজ-ফুটবল-ক্রিকেট, এককথায় আধুনিকতার সবকিছু বর্জন করা যায় তবে অবশ্যই ধুতিকে চিরকালের জন্য ধারণ করা যায়। কিন্তু

তাই কি আমাদের কাম্য ? সম্ভবও কি ? আর যাই হোক ১৯৫৭ সালের পর ১৯৫৯ সালই আসবে, ১১৫৯ (বল্লাল সেন) কিছুতেই নয়।

তারপর, স্বদেশী বলতে কি আমরা শুধু হিন্দুয়ানীকেই বুঝব ? আমরা যতই বলি না কেন ধুতি মুসলমানদের প্রচলিত পোষাক নয়, খৃষ্টানদের তো নয়ই। জোর করে চাপালে অবশ্য আলাদা কথা।

(২)

বিদেশী পোষাকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় আমাদের হয়ত এই কথাটা মনে থাকে না যে স্বদেশী পোষাক বলে বিশেষ কোন পোষাককে চিহ্নিত করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নয়। তা' ছাড়া ধুতি চাদরের যুগ যে শেষ হয়ে এসেছে, এ লক্ষণ স্পষ্ট। তবে কি পাশ্চাত্যের কোট-প্যাণ্ট-টাই এদেশে চালু হবে ? হয়ত তাই, কিম্বা হয়ত উত্তর প্রদেশে প্রচলিত পোষাক, অর্থাৎ নেহরুকে সচরাচর যে ধরনের পোষাকে দেখা যায়—সেই রকম কোন পোষাক সারা ভারতের মত বাংলাতেও প্রচলিত হবে *।

যাই হোক, আমাদের পোষাক কি জাতীয় হওয়া উচিত এই মীমাংসার আগে পোষাকের প্রচলন কিভাবে হয়, মানুষ আদৌ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে কেন সেই বিষয় সামান্য আলোচনা চলতে পারে।

মানুষ পোষাক পরে কেন ?—আপনি বলবেন, এ তো অতি সহজ কথা,—লজ্জা নিবারণ করার জন্য। অন্য কেউ হয়ত তার সঙ্গে যোগ করে বলবেন, শীতাতপ থেকে শরীরকে রক্ষা করাও একটা কারণ বটে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দু'টি উত্তর সহজগ্রাহ্য

* আমাদের আলোচনা আপাতত নাগরিক পুরুষের পরিচ্ছদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মেয়েদের পোষাক এখনও ঠিক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি—এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত।

হলেও মূল কারণ অন্য। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞান কোন প্রশ্নই শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণার উপর ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। পরিচ্ছদও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। পরিচ্ছদের ইতিবৃত্ত নিয়েও অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে।

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক Westermark অসংখ্য উদাহরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিচ্ছদের সূত্রপাত ঘটেছে যৌন আকর্ষণের উপায় স্বরূপে *। সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই এ বিষয়ে Westermarkকে সমর্থন করেন †। যৌন আকর্ষণ ছাড়াও সামাজিকভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় অথবা বিশিষ্ট করে তোলার মনোভাবও যে পরিচ্ছদের সূত্রপাতে বর্তমান ছিল এ কথা জোর করে বলা চলে ‡। দক্ষিণ আমেরিকায় বোরোরো উপজাতির মধ্যে সর্দার অথবা সমাজে যারা উচ্চপদস্থ, তারা মাথায় মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর পাখীর পালক ইত্যাদি গোঁজে—যে যত উচ্চপদস্থ তার আভরণ তত সংখ্যাধিক। নারী পুরুষ কেউই অধোবাস পরে না। নারীরা সম্পূর্ণ ই উলঙ্গ থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ উপজাতিই যৌন প্রদেশ আচ্ছাদন করার বিষয়ে কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, কিন্তু সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপক পালক ইত্যাদি ব্যবহার সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Ruth Benzel বলেছেন, "chief function of ornament is display, either sexual or social (Encyclo-

---

*Edward Westermark—History of Human Marriage.

† '...such races as go naked, are by no means deficient in modesty, and the first garments worn were perhaps used in erotic dances as a means of excitement' (Quentin Bell—On Human Finery, 1947).

‡ "The impulse towards decoration is the most constantly recurring motivation in the history of clothing...the one which is found also among higher apes" (Ruth Benedict. Ency. of Social Sciences—Dress).

paedia of Social Sciences—Ornament)। পোষাক সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

Frazer এবং Karsten প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতে পরিচ্ছদের সূত্রপাত ঘটেছে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার (magic) মাধ্যমে। একথা আমাদের মোটামুটি জানা যে সভ্যতার সূচনায় মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শস্য এবং বংশবৃদ্ধি। এই দুই উদ্দেশ্যে আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক সব রকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাহায্যই সে নিত। একদিকে যেমন অনুকৃতিমূলক ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার (imitative magic) সাহায্যে ফসল বাড়াবার চেষ্টা ঘটেছে, তেমনি সুফল-প্রতীক বিভিন্ন জিনিস দেহে ধারণ করে বংশবৃদ্ধির আশা করা হয়েছে; আবার অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকেও দেহকে, বিশেষভাবে জননেন্দ্রিয়াদিকে রক্ষা করার চেষ্টায় অঙ্গ বিশেষকে আচ্ছাদন করার প্রচলন ঘটে (James Frazer—'Totemism and Exogamy')। এই মতের সমর্থনে অসংখ্য তথ্য ক্রম-বর্ধমান। নানা রকমের কবচ, কুণ্ডল, ইত্যাদির ব্যবহার (অলঙ্কারের আদিরূপ এইসব কবচ কুণ্ডলের মধ্যে স্পষ্ট) ছাড়াও শরীরে ভস্মাদি লেপন, বিভিন্ন চিহ্ন, পূত বস্ত্রখণ্ড বা অন্য বিভিন্ন জিনিস ধারণ প্রায় সব স্থানেই কোন না কোন যুগে প্রত্যক্ষ। এই সবের ব্যবহার নিঃসন্দেহে ইন্দ্রজালমূলক। J. C. Flugel-ও মোটামুটিভাবে এই মতের সমর্থন জানিয়ে আবার অন্য আর একটি দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

"......in general the earliest forms of art served utilitarian (*i. e.*, magical) rather than purely æsthetic ends. If this is true with regard to clothes, it may be said that the motive of decoration in dress, in its earliest manifestations, gradually grew out of the magical utilitarian motive in much the same way as that in latter forms of art, instruments and other objects, originally constructed to serve some useful purpose, became deco-

rative, and eventually, in certain cases, persisted as decorations" (J. C. Flugel—The Psychology of Clothes, 1930).

বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগাদায় সুরু হয়ে বসন পরিণত হয়েছে ভূষণে, শিল্পকলা, সব কিছুরই সৃষ্টি এই একই ভাবে; কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির তাগাদায় মানুষ সব কিছুকেই রূপমণ্ডিত করে তোলে। সজ্জাস্পৃহাই যে আধুনিক ফ্যাশনে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিচ্ছদের সূত্রপাতে ফ্যাশনের কোন প্রভাব আদৌ ছিল কিনা সে প্রশ্ন মীমাংসা-সাপেক্ষ (আমাদের ধারণায় ফ্যাশন একান্তই সভ্যতার আধুনিক অবদান, প্রাচীনকালে ফ্যাশনের অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। অন্তত পোষাকে ফ্যাশনের প্রভাব প্রধানত রেনেশাঁসেঁর পর থেকেই অনুভূত), কিন্তু বর্তমান কালে পোষাকের উপর ফ্যাশনের প্রভাব যত দুর্নিবার তত আর কিছুই ছিল না। বর্তমান যুগে পোষাকের গতিপ্রকৃতি প্রধানত ফ্যাশনই নিয়ন্ত্রিত করে একথা মনে রাখলে আমাদের আলোচনার সুরাহা হবে।

পরিচ্ছেদের প্রবর্তনে অবশ্য শীতাতপ নিবারণ প্রচেষ্টাও অংশত দায়ী হতে পারে, তবে তা' যে প্রধান নয় সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। শীতপ্রধান অনেকস্থানেই আদিম অধিবাসীরা অর্ধনগ্ন বা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে (যেমন, মধ্য এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, বা দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠি)। এস্কিমোরা ঘরের বাইরে পোষাক পরলেও ঘরে (বরফের) ঢোকবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘরে ঢোকে, এবং ভিতরে উলঙ্গ অবস্থাতেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে বসবাস করে *। Carlyle তাই রায় দিয়েছেন,

* (1) Robert Briffault-এর Mothers. Vol III Chap xxvi দ্রষ্টব্য।

(2) Havlock Ellis-এর মতে "It is evident that in the beginning protection is too little or no extent the motive for attaching foreign substances to the body" (Studies in the Psychology of Sex. 1923).

"The first purpose of clothes···was not warmth or decency, but ornament."

আমাদের আলোচনা কিছুটা কেতাবী হলেও অন্তত এইজন্যই প্রয়োজনীয় যে পরিচ্ছদের সূত্রপাত এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেকেই মনে করেন যে যুক্তি অথবা প্রয়োজনের তাগিদে পোশাকের চরিত্র বদলান যায়। এই ধারণাতেই অনেকে পোশাক সম্বন্ধে বিভিন্ন রায় দিয়ে বসেন। কেউ কেউ সমস্ত জাতির পোষাক হিসেবে কোন ইউনিফর্মের প্রচলন সুপারিশ করেন। কিন্তু পোশাককে এভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। জাতীয় পোষাক কখনই ফরমায়েসের উপর গড়ে উঠবে না।

পাশ্চাত্যপোষাকের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুই তরফেই প্রধান যুক্তি উপযোগিতা। একদল বলেন এ পোষাক আধুনিক কল-কারখানা-অফিস-কাছারির উপযুক্ত, ট্রামে বাসে চলাফেরার জন্য অপরিহার্য। অন্যপক্ষ বলবেন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আঁটসাট প্যাণ্টকোট আর গলাবন্ধ 'টাই' একান্ত অনুপযোগী এবং অস্বস্তিকর। এই নিয়ে বাদপ্রতিবাদের অর্থ হয় না। পোষাকের বিবর্তনে যে উপযোগিতার প্রশ্ন খুব প্রাধান্য পায় না সেকথা আগেই আলোচিত। তবে পোষাককে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত না করা গেলেও (অন্যান্য যে কোন বিষয়ের মত পোষাকও রাষ্ট্র থেকে আইনের বলে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু তা' যে কাম্য নয় সে বিষয়ে সবাই একমত হবেন), ফ্যাশানকে পরিবর্তিত করা সম্ভব। সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা বা অভিনেতৃসহ) এই ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ভূমিকা আছে। তাই প্রয়োজনবোধে এঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় অবাঞ্ছনীয় প্রবণতা থেকে পোষাকের ফ্যাশনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য পোষাক সম্বন্ধে অন্য কয়েকটি দিক বিশেষভাবে ভাববার আছে, এবং তার অবাঞ্ছনীয়

দিক যদি এই ভাবে বর্জন করা যায় তবে সেদিকে রাষ্ট্র এবং সমাজ নেতাদের দৃষ্টি সঞ্চালন করতে হবে।

পাশ্চাত্যপোষাক, অর্থাৎ যে পোষাকে আমরা ইংরেজদের দেখে আসছি, এদেশের সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির আয়ত্বের বাইরে। এই দারিদ্র্য চিরস্থায়ী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে না এবং সাধারণ পোষাকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপোষাকের বর্তমান উচ্চ মূল্যমানও যে নাবিয়ে আনা যাবে না একথাও ঠিক নয়, কিন্তু পোষাকের মাধ্যমে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার মনোবৃত্তিকে যদি মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতা বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে পাশ্চাত্য-পোষাকের বিরুদ্ধতা অপরিহার্য, কারণ এই পোষাকে ধনী-দরিদ্রের অসাম্য যত ফোটে অন্য কোন পোষাকে তত নয়। আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে এবং তাই যে কাম্য একথা যদি আমরা মেনে নেই তবে পাশ্চাত্য পোষাকের এই প্রবণতার দিকে চিন্তা করতেই হবে। যদি সাম্য আনতে হয় তবে ব্যয়সাধ্য পোষাককে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। একথা ক্রমশ স্বীকৃত যে মনের উপর পরিচ্ছদের প্রভাব যথেষ্ট। তা' ছাড়া একদিকে যদি কে কত দামী পোষাক পরতে পারে তার অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে তবে এদেশে কখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাবে না, কারণ এই মনোভাব শুধু পরিচ্ছদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গড়া শান্তিনিকেতনে প্রচলিত পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। শান্তিনিকেতনে কোন দিন কোন বিশেষ ধরনের পোষাক বেঁধে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু সর্বভারতীয় সংস্কৃতির এই মিলন ক্ষেত্রে পাজামা-পাঞ্জাবি-চাদর সহ যে ধরনের পোষাক ছাত্রদের মধ্যে রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে বাংলার অন্যত্র বিশেষত লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্ম্মী মহলে তার ছাপ পড়েছে

একথা স্বীকার করতেই হবে। যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা' হ'ল এই ধরনের পোষাকও আজকাল ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের পোশাক কি জাতীয় হবে এখনি এ সম্বন্ধে রায় দেওয়া সম্ভবপর নয়। ফ্যাশন পরিচ্ছদের হেরফের নিয়ন্ত্রিত করে একথা ঠিক, কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে ফ্যাশনও সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া পোষাক পরিচ্ছদই হোক আর অন্য যে কোন সামাজিক অনুষঙ্গই হোক, একেবারে ঐতিহ্যবিমুক্ত ভাবে কোন কিছুই কায়েমী হয়ে বসতে পারে না। তাই আমাদের আগামী পরিচ্ছদ একদিকে যেমন দেশায় ঐতিহ্যের ধারাবাহী হবে, অন্যদিকে আবার যুগধর্মের প্রভাবেও কিছুটা রূপান্তরিত হতে বাধ্য। সবশেষে, ফ্যাশনের প্রভাবকে অস্বীকার না করেও একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতার আবহাওয়ায় ফ্যাশনের যে-ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ায় তার সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যাওয়া কল্পনাতীত নয়!

সমাজে তরুণের ভূমিকা

তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নালিশের অন্ত নেই। উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লঘুপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রচুর বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় তাদের সম্বন্ধে, হয়ত সঙ্গত কারণেই। হয়ত তার চেয়েও গুরুতর অনুযোগের কারণ ঘটেছে গত কয়েক বছরে। একথা স্বীকার করে নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তরুণ সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদির জন্য বিচ্ছিন্নভাবে শুধু তরুণেদের দায়ী করা যায় কি ? বস্তুত তরুণদের উপর দোষারোপে 'প্রবীণ'দের আত্মশ্লাঘা যতটা প্রকাশ পায়, ততটা দুর্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁদের সত্যিকারের কোন দুর্ভাবনা থাকলে তাঁরা সমস্যাটিকে আরও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেন এবং তা' হলে যে সমাজ-ব্যবস্থার তল্পিবাহী তাঁরা, তার যথার্থতা নিয়ে তাঁদের মনে সংশয় দেখা দিত। এখানে 'প্রবীণ' বলতে আমরা তাঁদেরই বলছি যাঁদের হামেশাই ট্রামে-বাসে পান-চিবানো হাল্কা মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে দেখা যায়; সাধারণত এঁরা সমস্ত আধুনিকতা এবং প্রগতিরই বিরোধিতা করেন, আধুনিক সমাজধারাই যে সমাজের যত কষ্টের মূল সে বিষয়ে এঁরা নিঃসন্দেহ। মোটামুটিভাবে তাই এঁদের রক্ষণশীলদের শিবিরভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। বলা বাহুল্য, যে বয়সে-প্রবীন মাত্রই রক্ষণশীল নন, বয়সে-নবীনদের মধ্যেও এইরকম 'প্রবীণে'র দেখা বহু মিলবে। সংখ্যাতেও এঁরা উপেক্ষণীয় ন'ন।

স্পষ্টতই সামাজিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু গলদ দেখা দিয়েছে, যার ফলে তরুণের পক্ষে বিপথগামী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার সমাধানে নানা মত হবেই। বর্তমান প্রসঙ্গে আপাতত এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করা আমাদের

লক্ষ্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য, আমরা তরুণদের কাছ থেকে কী আশা করি—সমাজে তরুণের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হ'লে তরুণ সম্প্রদায়ের বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সব সমাজে তরুণের (কিম্বা প্রবীণের) স্থান একরূপ নয়। চীন দেশে বৃদ্ধের যে সম্মানলাভ ঘটে, তার এক দশমাংশও সম্ভবত আমেরিকার বৃদ্ধের জোটে না। সম্মানের এই অসম-বণ্টনের কারণ আর কিছু না। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তার উপরই তার সম্মান নির্দ্দিষ্ট হয়, কাজেই যে-সমাজব্যবস্থায় প্রবীণের ভূমিকা গুরুতর সেই সমাজে সম্মান বয়সানুপাতিক, অন্যতর সমাজব্যবস্থায় বয়সের সম্মান তুলনায় কম। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তরুণের যে ভূমিকা, সেই তুলনায় আধুনিক সভ্যতায় তার ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন বা একতরফা (unilateral) কি না, Pitrim A. Sorokin-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ Social and Cultural Dynamics প্রকাশের পর থেকে সেই প্রশ্নে যথার্থ কারণেই মতদ্বৈধতা থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ যে সনাতন বা অপরিবর্ত্তনীয় নয় এই সিদ্ধান্ত সমাজবিজ্ঞানে সর্বজনস্বীকৃত। এ কথাও সত্য যে, সামাজিক পরিবর্ত্তন সর্বদা সমগতিশীল নয়। যে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন বাহ্যত প্রায় অদৃশ্য সেই সমাজকে স্থৈতিক * (static) সমাজ বলা চলে। কৃষিনির্ভর সামন্ততন্ত্রের পূর্ণবিকাশের যুগে স্থৈতিক সমাজের উদাহরণ আমরা পাই। এই সমাজে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আশু-প্রয়োজনীয় নয়, কারণ প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির উপর আস্থা অটুট। স্বভাবতই এই সমাজ প্রবীনের অভিজ্ঞতার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তাই প্রবীণের স্থান অনেক

* স্থিতিশীল শব্দটি আমাদের মনঃপুত নয়, কারণ শব্দটি স্থাণুর ভাবার্থ আনে, সমাজ কখনই স্থাণু নয়। 'স্থিতাবস্থা' শব্দটিও একই কারণে অগ্রাহ্য।

উচ্চে। তরুণের কর্ত্তব্য অনেকাংশেই বাধ্যতায়, নিয়মানুবর্তিতায় এবং ঐতিহ্যের ধারাবহনেই সীমাবদ্ধ। তরুণদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তার যথোচিত ব্যবহার করা দূরের কথা, মনে হয় সেই শক্তির অবদমনেই সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। এই উক্তির সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় অনায়াসলভ্য, ভারতবর্ষে ত বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ।

চলিষ্ণু (dynamic) সমাজে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সমাজের পরিবর্ত্তনের তাগিদ তীব্র। এই তাগাদায় তরুণ সম্প্রদায়ের ডাক পড়ে সর্বাগ্রে। তাই তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় শতগুণে। তা' ছাড়া, বর্ত্তমান নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল যন্ত্রসভ্যতায় বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের যে মর্য্যাদা, বয়সের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মর্য্যাদা কখনই তার সমকক্ষ হতে পারে না; আর বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান আহরণ প্রচুর সময়সাপেক্ষ নয়। এই কারণে প্রবীণের গুরুত্ব কমে যাবে স্বভাবতই। স্থৈতিক সমাজে গণআন্দোলন সর্বদা দৃষ্ট নয়, কিন্তু চলিষ্ণু সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণআন্দোলন। আন্দোলন মাত্রেই তরুণ সমাজের মুখাপেক্ষী। তরুণদের একাংশ, ছাত্রসম্প্রদায়ের গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। নেতারা প্রায়ই ছাত্রসমাজকে সর্ববিধ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু চুল না ভিজিয়ে যেমন সাঁতার কাটা যায় না তেমনি আন্দোলনে ছাত্রদের বর্জন বা ছাত্রদের আন্দোলন বর্জন করা প্রায় অসম্ভব।

অর্থকরী আয় ব্যবস্থা (mode of earning) তথা পরিবার-প্রথার পরিবর্ত্তনেও তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক মর্য্যাদার তারতম্য ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসভ্যতায় আয়ব্যবস্থা পারিবারিক ভাবে যৌথ। পারিবারিক আয়ে পরিবারের প্রায় সকলেরই (শিশু বাদে) অংশ ছিল, অবশ্য পারিবারিক কর্ত্তার নেতৃত্বে। পেশা প্রায়শই পারিবারিক এবং পুরুষানুক্রমিক ছিল। এই ব্যবস্থা

স্বভাবতই একান্নবর্তী পরিবারের ধারক। এই ধরণের যৌথ আয়ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাপ তথা কৃতিত্ব এবং তদনুযায়ী ব্যক্তিগত গুরুত্বলাভের সম্ভাবনা নাই, ফলে অভিজ্ঞতা এবং পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থার মানসিকপ্রবণতায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ স্বাভাবিকভাবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এবং বয়সানুক্রমেই অন্যান্যের আনুপাতিক মর্য্যাদা ও গুরুত্বের সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে এই পরিস্থিতিরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নাগরিক সমাজে আমরা একান্নবর্তী পরিবারের জের টানলেও এই পরিবার-প্রথায় যে অসেতু-সম্ভব ফাটল ধরেছে তা' প্রত্যক্ষ। এর কারণ, সামন্ততান্ত্রিক যৌথ আয়ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। আমাদের বর্ত্তমান আয়ব্যবস্থা ব্যক্তিমূলক। একই পরিবারে একভাই কেরাণী, একভাই ব্যবসায়ী, এবং এক ভাই হয়ত মিলের মজুর (উচ্চ নীচ উভয়বিধ হতে পারে)। তাদের আয় ভিন্ন ভাবে পরিমাপ-সাধ্য। প্রায়শই একজনের আয় অন্যের চেয়ে অনেক বেশী এবং তা বয়সানুপাতিক নয়। ক্রমশই চাকুরির পরিচয়ে বয়সানুপাতিক মর্য্যাদা আয়-অনুপাতিক মর্য্যাদাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে।

মূল পারিবারিক বন্ধন ও ঐক্যও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন; ভাতের হাঁড়ি আর বাড়ীর ছাদ ছাড়া নাগরিক একান্নবর্ত্তী পরিবারে আর কোন ঐক্য নেই। যেখানে মনের মিল নেই সেখানে শ্রদ্ধার প্রশ্ন ওঠে না, অন্তত অন্তরে শ্রদ্ধা থাকলেও ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা সমগ্র পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বার্থরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব (এই দায়িত্ববহনে তাঁরা প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করতেন) থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিচ্ছেন। আর তাঁদের এই দায়িত্বত্যাগের ফলে তাঁদের সম্মান আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার এই ছাপ আবার সমগ্র সমাজের উপর পড়ছে।

সর্বশেষে, তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক স্থান বা মর্য্যাদা

নির্দ্ধারণে ধর্ম্মেরও একটা অবদান ছিল। স্থৈতিক সমাজে অধিকাংশ ধর্ম্মেই প্রবীণের প্রাধান্য নির্দিষ্ট ছিল। এ যুগে, প্রচলিত অর্থে ধর্ম্মের যুগ শেষ হয়ে এসেছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। নতুন যুগের ধর্ম্মে তারুণ্যের মর্য্যাদা যে বেড়ে যাবে তা নিঃসন্দেহ। তা' বলে প্রবীণত্বের জন্য অসম্মানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, আসল প্রশ্ন সামাজিক গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার।

সনাতনী সমাজ

এতদ্দেশীয় সনাতন ধর্ম্মের ধ্বজাধারী রক্ষণশীল মহাশয়গণ বর্ত্তমান সভ্যতার উপর বীতস্পৃহ। পুণ্যভূমি ভারতের মহান ঐতিহ্য স্মরণে এঁদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায় এবং প্রাতঃস্মরণীয় মুনি-ঋষিগণের রোমাঞ্চকর কার্য-কলাপের পর্যালোচনায় এঁদের মুহুর্মুহু স্বেদ কম্প হয়। এঁদের ভক্তির প্রাবল্য আমাদেরও মুগ্ধ করে বৈকি। স্বদেশের প্রতি মমতা একান্ত স্বাভাবিক, স্বদেশের গৌরবে আমরা আত্মগৌরবই অনুভব করি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তা কাম্যও বটে। তবে সমস্যা ওঠে যদি অতীতের পতাকাবাহীরা বর্ত্তমানকে অর্থাৎ বাস্তবকে সম্পূর্ণ লোপাট করার চেষ্টায় ব্রতী হন এবং এই অতীত ভবিষ্যতকেও গ্রাস করার উপক্রম করে।

আজ পর্যন্ত যত রকম সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে, কোন সমাজব্যবস্থায়ই জীবনসংগ্রাম ছাড়া জীবনধারণ সম্ভবপর হয়নি, একথা মহাশয়গণ স্মরণ রাখেন না। অতীতে যে জীবন-সংগ্রামের ঘাটতি ছিল না, এ তথ্য তাঁদের কল্পনায় পীড়াদায়ক, কারণ বর্ত্তমান জীবনসংগ্রাম থেকে পলায়নের একমাত্র উপায় তাঁরা অতীতের পথেই অনুসন্ধান করেন। কথায় কথায় এঁরা মুনি ঋষিদের আদর্শ জীবনযাত্রার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। (মুনি ঋষিদের জীবনযাত্রা আদৌ আদর্শ কিনা সে সংশয় প্রকাশে হয়ত এঁরা মূর্চ্ছা যাবেন, তাই সে প্রশ্ন মুলতুবী থাক)—আহা, তপোবনের সেই পবিত্র জীবন, 'plain living and high thinking'—সে জীবন কী আর আসবে ? ম্লেচ্ছাচারে দেশ ভরে গেল, দেবদ্বিজে আর ভক্তি নেই, ধর্মে নেই মতি—দু'পাতা ইংরেজী পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে! মুনি ঋষিরা তাঁদের অলৌকিক

শক্তির বলে যে সব বিধান দিয়ে গেছেন সেই শাস্ত্র বিধান লঙ্ঘন করার স্পর্ধা অর্বাচীনের দল কোথায় পায় ?

মহাশয়েরা তাই আধুনিকতার উপর বিষম চটা! আধুনিক ভাবধারাই যত নষ্টের গোড়া! আধুনিকতাকে পুরোপুরি বর্জন না করলে জনসাধারণের কোন উপায় নেই; সেই পবিত্র তপোবনের জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই!

অতীতের জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার মোহ যে শুধু সনাতনীদেরই আচ্ছন্ন করেছে, একথা ভাবলে ভুল করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বহু ফ্যাশনেবল নাগরিকের মধ্যে পর্যন্ত এই মনোবিলাস দৃষ্টিগোচর। তাছাড়া, জনসাধারণের মধ্যেও এই মনোভাব, তথা আধুনিকতা-বিরোধী মনোভাব কিরকম প্রবল তা' বোঝা যায়, যে সব সস্তাদরের নাটক নভেল এবং চলচ্চিত্র আধুনিক মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে, বিশেষত নারীপ্রগতিকে হাস্যাস্পদ করে, তাদের জনপ্রিয়তা দেখলে। (একথা ঠিক যে বিভিন্ন শক্তিশালী লেখকের বা চলচ্চিত্রকারের বলিষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে প্রগতি এবং আধুনিক ভাবধারা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে, তবু একথা অনস্বীকার্য যে জনসাধারণের বিপুল অংশ এখনও আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ।)

এই 'তপোবনের জীবনযাত্রা' বলতে মহাশয়েরা কি বোঝেন, তা তাঁরাই জানেন। ভারতের অতীত যুগে ফিরে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য এটুকু বোঝা যায়, কিন্তু ভারতের অতীত কোন নির্দ্দিষ্ট একটা যুগে বাঁধাধরা আটকে থাকেনি। ভারতের অতীত বলতে এঁরা কি বোঝেন সে বিষয়ে নিজেরাই স্পষ্ট কিনা সন্দেহ। 'plain living and high thinking'—অর্থাৎ সহজ জীবন এবং মহৎচিন্তা—কথাটা তাঁদের মনে ধরেছে কারণ জীবনসংগ্রামের কোন আভাস এই কথাটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কথাটাকে

তাঁরা পানের মতোই চর্বিতচর্বন করেন। মুস্কিল হল, ইতিহাস সর্বদা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়না। ভারতবর্ষে তপোবনের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজজীবনে 'plain living and high thinking'-বিশিষ্ট এই 'তপোবনের যুগ' আদৌ কোনকালে ছিল কিনা তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। যদি থেকেও থাকে তবু আমাদের পক্ষে সেই ধরনের জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া কাম্য অথবা আদৌ সম্ভবপর কিনা তাও ভেবে দেখবার।

প্রথমতঃ, এই তপোবন প্যাটার্ণের জীবনযাত্রা কি জাতীয় সে বিষয়ে নিজেদের স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যাক্। যদি ধরা হয় এই জাতীয় সমাজে মানুষের আহার্য হ'ল ফলমূলাদি প্রকৃতি-দত্ত খাদ্য এবং সেই সঙ্গে পরিধানে গাছের বাকল, এবং গুহা কিম্বা বনজঙ্গলে আবাস নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পরম সন্তোষে বেদ-বেদান্তের আলোচনাতেই সুখে কালাতিপাত করতেন তবে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যে যুগে মানুষ জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর ছিল, সেই যুগে বেদ-উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য ঋগ্বেদে পশুপাল মানব গোষ্ঠীর আভাস পাই, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বরূপ প্রাক-কৃষি বা আদি-কৃষিযুগের সাক্ষ্য বহন করে। যাই হোক, ঋগ্সাহিত্যে তদানীন্তন জীবনযাত্রা যদিবা কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা কখনও সহজ জীবনের ছবি নয়।

'High thinking'-ওয়ালাদের জন্য অবশ্য পৃথক এলাকা বা উপনিবেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে, যেখানে তাঁরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সহজ জীবন যাপন করে উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারেন। কিন্তু তা একমাত্র সম্ভব যদি এই high thinking-শ্রেণী বিশেষের ভরণপোষণের জন্য একদল মেহনতি 'মোটাবুদ্ধি' মানুষের অস্তিত্ব থাকে। ভারতবর্ষে আর্য high thinking-ওয়ালারা অনার্য বা দাসজাতিকে এইভাবে বহুকাল শোষণ করার ফলেই বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্ভবপর হয়েছিল এ অনুমান

নিতান্ত অসঙ্গত নয়। সহজ জীবনের নামে যে যতই লাফান, সেই বল্কলসম্বল, ফলমূল-নির্ভর বুনো জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার প্রস্তাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় উটপাখীগন রাজী হবেন কিনা সন্দেহ। যদি রাজী হন তখন প্রশ্ন ওঠে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে,—শ্রদ্ধেয় সনাতনীদের দৃষ্টিসীমানায় আর্যাবর্তের বাইরে মনুষ্যজাতির, অন্তত সভ্য মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকৃত) এমন কোন অঞ্চল কি আছে যেখানে বর্ত্তমান বিপুল জনসমষ্টির পরিমাপে যথেষ্ট পরিমাণ ফলমূলাদির সংস্থান আছে? এই প্রশ্ন অবশ্য আধুনিক (ম্লেচ্ছভাবাপন্ন!)। এই ধরণের সংশয় প্রকাশ ধৃষ্টতারই পরিচায়ক!—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। তবু যত বড় সাত্বিকই হোন, পেটের প্রশ্নটাকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা পবিত্র তপোবন-সমাজ গড়তে এগোবেন কিনা সন্দেহ!

অতএব, অন্তত কৃষিকার্য আবশ্যক। কিন্তু কৃষিকার্য করবে কে? high thinking-ওয়ালারা যদি হল ধরতে রাজীও হ'ন তবু সমাজে কর্মবণ্টন (division of labour) অনিবার্য, কেননা লাঙ্গল, ইত্যাদি কৃষিকার্যের হাতিয়ার (tools) তৈরী করার জন্য একদল আলাদা লোককে ব্যস্ত থাকতেই হবে (সকালবেলা লাঙ্গলের ফলা তৈরী করলাম, দুপুর বেলা চাষ, আর রাত্রিবেলা কাপড় বুনলাম—কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা এত সহজ নয়; ক্ষেত সারাদিনের শ্রম দাবি করে। চাষ অবশ্য সারা বছরের কাজ নয়; যে সময় চাষী বেকার থাকে সে সময়টা লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরী করতে পারে বলে কল্পনা করা চলে। কিন্তু লাঙ্গল-ইত্যাদি তৈরী করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই সব কাজেও কিছুটা Specialization দরকার। এই Specializaton এর অনিবার্য প্রয়োজনেই অতীতে কর্মকার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। আজ মানবজীবনযাত্রার গোড়ার ব্যবস্থায় ফিরে গেলেও কর্মবণ্টনের পুনরাবৃত্তি না ঘটবার কোন কারণ নেই। লাঙ্গল ছাড়া কৃষিকার্য অসম্ভব।

গাছের মরা ডাল দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের উৎপাদন যে হবে না, সেকথা আশা করি আমাদের শ্রদ্ধেয় উট-পাখীগন স্বীকার করবেন।

এখানে আবার জনসমষ্টির সেই অশ্লীল প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জনসংখ্যা চিরকাল বেড়েই চলেছে (পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক পরিস্থিতি জানি না)। যে যাই বলুন, পুরাণাদি পবিত্র গ্রন্থ থেকে যে সব নজীর পাই তাতে প্রাতঃস্মরণীয় মুনি ঋষিদেরও, কি নিজেদের সংসারে, কি জনসাধারণের ক্ষেত্রে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিল বলে বোধ হয় না; বরং তাঁদের বর-আশীর্বাদ মারফৎ বংশবৃদ্ধির কামনাই প্রকাশ পায়। বহুবিবাহের প্রথাও নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যই প্রচলিত ছিল (শ্রদ্ধেয় সনাতনীগণ যদি কিছু মনে না করেন ত বলব যে, সমাজ-বিজ্ঞানের মতে কৃষি নির্ভর-সমাজে সর্বদেশেই লোকবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, আমাদের দেশেও বিবাহপ্রথা বা অন্যান্য যে-কোন শাস্ত্রবিধানও কৃষিনির্ভর সমাজের সেই বৈষয়িক বিবেচনা থেকে বিচ্যুত নয়।) বর্ত্তমান যুগেও, আধুনিকভাবাপন্ন পরিবারের চেয়ে 'সনাতন পন্থী' রক্ষনশীল পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ এবং সচেতনতা বেশী একথা অবিশ্বাস্য। জনসংখ্যা বেড়েই চলছে এবং যে হারে তা বেড়ে চলেছে তাতে কৃষিপদ্ধতির প্রাচীন উপায় যে আর জনসমষ্টির বিপুল খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারবে না তা নিশ্চিত। কিন্তু কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতি শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই সম্ভব। আর আধুনিক যন্ত্রপাতি মানেই আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি। অর্থাৎ বর্ত্তমান সভ্যতাকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।

'High thinking'-এও specialization দরকার। সারা-দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ধ্যানে বসলাম, আর অমনি আকাশ থেকে এক একটি মহদ্ভাবনা পাকাফলের মত টুপ টুপ করে

মগজের মধ্যে এসে খসে পড়বে, আর মধ্যে মধ্যে আমাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বেদ-বেদান্তের সূচনা করবে—এ কল্পনা মধ্যবিংশ শতাব্দীতে একটু দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে না কি? তাই, যতদিন না বিপুলসংখ্যক আর একদল অনার্য দাসজাতিকে পাকড়াও করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তথাকথিত plain living-এর সঙ্গে আমাদের high thinking-এর সামঞ্জস্য ঘটান শক্ত। এই দিক থেকে অবশ্য সনাতন জাতিভেদ-প্রথাকে জিইয়ে রাখার জন্য সনাতনীদের বিপুল উদ্যমের একটা সূত্র পাওয়া যায় (অবশ্য সনাতনীরা এতদূর তলিয়ে বিচার করেন এ অপবাদ দিতে কিছুটা সংকোচ বোধ করছি)!

সহজ জীবন আর উচ্চ চিন্তা কার না কাম্য? কিন্তু উচ্চ চিন্তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই মানসিক প্রস্তুতির জন্য আবার আগে দরকার সামাজিক প্রস্তুতির, অর্থাৎ সমাজের বৈষয়িক বুনিয়াদকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যে সেই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিরুদ্বেগে আত্মবিকাশের চেষ্টায় মনোনিবেশ করতে পারে। সেই সামাজিক সংগঠন কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমেই লভ্য, পলায়নে অসম্ভব।

অবশ্য আধুনিকতার সব কিছুই কাম্য এই দাবি একান্তই বাতুলতা। মানবসভ্যতার প্রতি স্তরেই ভাল মন্দের সমন্বয় ঘটেছে। সমাজসংগঠনে অবাঞ্ছনীয় দিক বা অসঙ্গতি না থাকলে সংশোধন তথা অন্যতর সমাজ সংগঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অসঙ্গতিই সামাজিক প্রগতির পথিকৃৎ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তিম পর্যায়ে যে-অসঙ্গতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তারই সূত্র ধরে আগামী সামাজতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। সেই নূতনকে আহ্বান করে আনাই আমাদের দায়িত্ব, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে গতাসুকে আঁকড়ে ধরে জীবনের কোন সার্থকতা, সংগ্রামের কোন সুরাহা খুঁজে পাওয়া যাবে না—আমাদের শ্রদ্ধেয় সনাতনপন্থীদের সমীপে এই আর্জিই অর্বাচীনের দল পেশ করছে।

করণিক প্রসঙ্গে

বাঙালী কেরাণীর জাত। হালে নাকি অনেকের কাছে কথাটা ভাল ঠেকছে না। তা, যদি বলি ভদ্রলোকের জাত, তবে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি উঠবে না! এবার ভেবে দেখুন, আসলে ভদ্রলোকও যা কেরানীও তা-ই। বলুন, ঠিক কি না ? তবে আমাদের কেরাণীর জাত বললে আর আপত্তি কিসে ? (বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের আলোচ্য বিষয় নাগরিক চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। কেরাণী বলতে আমরা যা বুঝি তা' নাগরিক অর্থেই প্রযুক্ত।)

'ভদ্র'সমাজে করণিক প্রাধান্য শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই করণিক প্রভাব নাগরিক জীবনে ত বটেই সমগ্র বাঙালীজীবনের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কেরাণীই বাঙালী জীবনের উচ্চাদর্শ। বাঙালীর সমাজধারা আচার-ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা সবেরই লক্ষ্য খাঁটি কেরাণী গড়া। কেরাণীর বৈশিষ্ট্য কি ? ভাল কেরাণী হবার জন্য কোন কোন গুণ অত্যাবশ্যক ? কলম-পেষায় বুদ্ধি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই না, খাঁটি কেরাণী হবার অন্তরায়ও বটে (আজ্ঞে হাঁ, যে বাঙালী বুদ্ধির দম্ভে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সেই বাঙালীর প্রধান পেশায় বুদ্ধির কোন স্থান নেই!)। প্রয়োজন এমন একটি নমনীয় ক্ষীণস্বাস্থ্য দেহের, যে দেহকে খুব সহজে কুঁজো করা যায়। নিজেকে উপযুক্ত কেরাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই দেহ-গঠন একান্ত প্রয়োজন, প্রথমতঃ, দশটা থেকে পাঁচটা অবধি এক নাগাড়ে (আধ ঘণ্টাখানেক বিরতি থাকে বটে।) এক টেবিলে মুখ গুঁজে কাজ করার পক্ষে শক্ত, সটান, সুস্থ দেহ একান্তই অনুপযুক্ত (ওই রকম 'চাষাড়ে' চেহারা ভদ্রজনোচিত নয়ও বটে!), দ্বিতীয়ত, সর্ব্বদাই উপরওয়ালাদের সামনে কুঁজো হয়ে থাকতে হয়; এইদিক থেকে সটান দেহ physically unfit! তাই এই ধরণের বেয়াড়া শরীর যাতে না

গড়ে ওঠে সেই দিকে বাঙালীর ছোটবেলা থেকেই নজর রাখা হয়। দেখুন, বাঙালী মায়েরা ছেলেদের চোখের আড়ালে যেতে দেন না। যে ছেলে যত চুপচাপ, কুনো এবং মায়ের আঁচল-ধরা সে তত 'লক্ষ্মী ছেলে'। দৌড়-ঝাঁপ হুটোপুটি করে এমন দুরন্ত অবাধ্য ছেলেদের মায়েদের মুখ দেখান ভার। তাই, ভাল করে বসতে না শিখতেই ঘরের এককোণে মাথাগুঁজে বসিয়ে ধারাপাত, নীতিকথা ইত্যাদি মুখস্থ করান হয়। ভবিষ্যতের আদর্শ কেরাণী-জীবনের মাথাগুঁজে বসার ট্রেনিং এই ভাবেই সুরু হয়। আবার দৌড় ঝাঁপে শরীর শক্ত সমর্থ হয়ে উঠতে পারে, সে ভয়ও আছে বুঝি!

তারপর আশৈশব সাধনায় যে কেরাণী-দেহটি তৈরী করা হয়, তাকে আবার সযত্নে ধাতস্থ রাখতে হয়। তাই কেরাণীর পক্ষে খেলাধূলা, ভ্রমণ কি অন্য কোন উপায়ে মুক্ত হাওয়া সেবন বিষবৎ পরিত্যজ্য। ভোরে ওঠা নিষেধ; ধোঁয়াটে রান্নাঘরে যদি সম্ভবপর না-ও হয় তবে অন্তত গলির কোন অন্ধকার চায়ের দোকানের কোণে বসে ডিস্‌পেপ্‌টিক-চা সহযোগে পরচর্চা বাঞ্ছনীয় (পরচর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন করণিক পদ্ধতি যে-মানসিক সঙ্কীর্ণতা-সৃষ্টিতে সহায়তা করে, তা সম্ভবত দৈহিক পুষ্টিকেও প্রতিরোধ করে, দেহ-মনের এই যোগাযোগ নিয়ে অনেক মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসক ভাবছেন)। বিকেলের আলো দেখার ভয় নেই। 'দশটা-পাঁচটা'র সুচিন্তিত সময়-বিন্যাসের জন্য বিকেলের আলো কেরাণী জীবনে অদৃশ্য। বাড়ী ফিরে এসেও সেই দেহ সাধনায় শৈথিল্য নেই। যে সব খেলা কুঁজো হয়ে বসে খেলতে হয়,—যেমন তাস, পাশা প্রভৃতি,—সেই ধরণের খেলাতে বা কিছুটা পরচর্চায় দেহটাকে এবং মনটাকেও কিছুটা ধাতস্থ রেখে বাড়ী ফিরে কিছু গেলা।

গেলার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, বাঙালী খাদ্যাখাদ্যের

ব্যাপারেও অত্যন্ত সাবধানী। খাদ্যে পুষ্টিকারিতাকে সযত্নে পরিহার করা হয়। এমন কি মাছ তরিতরকারী প্রভৃতি খাদ্যেও যাতে প্রোটিন বা ভিটামিন কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে সেজন্য সব কিছুই বিশেষভাবে ভেজে নেওয়া হয়। তারপরও যদি বা অবশিষ্ট থাকে সেজন্য প্রচুর পরিমাণে মসলা ব্যবহার করে খাদ্যকে একেবারে নির্দোষ করে নেওয়া হয়। দুধ-ঘির ব্যাপারে গোয়ালা এবং ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, ভেজালে তাদের কার্পণ্য নেই।

এই করণিক শরীর-গঠনে সমাজ ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহারের অবদানই কি কম? বাঙলার জননীদের কথা ভেবে দেখুন। সকলেই জানেন মায়ের স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে মেয়েদের শরীর কোনক্রমেই যাতে বেয়াড়া রকমে পুষ্টিলাভ না করে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। যেমন, প্রথমত ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হেঁসেলের আঁচে রেখে তাদের শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। মেয়েদের পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম বা সমার্থক শরীর সঞ্চালন এদেশে অতিশয় নির্লজ্জ ব্যাপার, প্রায় গো-হত্যার মতই কল্পনাতীত। সবাই জানি, আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে কি রকম গর্হিত বলে মনে করেন। তাদেরও পরচর্চা একমাত্র অবসর-বিনোদন, কোঁদল একমাত্র রাজনীতি। মোটকথা, এই জননীদের গর্ভে সুস্থ সন্তানের জন্ম, জলে পাথর ভাসার মতই কষ্টকল্পনা সাধ্য।

আদর্শ কেরাণী হবার দৈহিক প্রস্তুতির মত মানসিক প্রস্তুতিতেও ত্রুটি নেই। কায়িক পরিশ্রমের দিকে যাতে কোন রকম ঝোঁক না আসে সেইজন্য সামাজিক আবহাওয়াকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। আমাদের দেশের লিখিত বা অলিখিত আইন, কানুন, মানুষের আচার, ব্যবহার প্রায় রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশের' মতই। কোন রকম সামান্য পরিবর্তনও ঘটান মুস্কিল। আমাদের সনাতন

ধর্মের দেশে অনাচার চলবে না! মনু-কৌটিল্য যা বলে গেছেন তার উপর আবার কথা থাকতে পারে নাকি? 'চিরদিন' যা চলেছে, এ পুণ্যভূমিতে চিরদিন তা চলবে। 'ছোটলোক' চিরদিনই ছোটলোক থাকবে। খেটে খাবে ভদ্রলোকের ছেলে?—ওমা, কি ঘেন্নার কথা! লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালকের পক্ষে সবচেয়ে কঠোর ধিক্কারের নমুনা—"লেখাপড়া শিখবে কেন? যাও চাষ করে খাওগে, যাও।" বলুন ত, চাষ করার মত লজ্জাকর কাজ আর কিছু হতে পারে? না, সেদিকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। ছোটবেলা থেকেই বাঙালী বালক দেহে মনে আদর্শ কেরাণী হয়ে গড়ে ওঠে (অবশ্য সকলে যে কেরাণী হবার সৌভাগ্যলাভ করে তা নয়, কিন্তু সে কথা অবান্তর)।

আদর্শ কেরাণীর আর একটি গুণ কি?—নির্বিচার আনুগত্য, ওপরওয়ালা যা বলেন, সেইভাবে কলম পেশা। চিন্তার কোন অবকাশ নেই। চিন্তা করার বদভ্যাস থাকলে কেউ কোনদিন ভাল কেরাণী হতে পারবে না। এই দিকেও আমাদের ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভালছেলেদের মানসিকতা কেরাণী-সুলভ করার ব্যবস্থা আছে। মুখে কথা ফুটতে না ফুটতে শেখানো হয়, "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে......" ইত্যাদি।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভাবুন। দাসসুলভ অন্ধ মনোবৃত্তির পক্ষে এই শিক্ষাপদ্ধতি কত কার্যকরী ভেবে দেখুন। মুখস্থরীতি, নীতিকথামালা, চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে ক্লাস, অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্র বিপর্যস্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানে চূড়ান্ত অবহেলা, আত্মনির্ভরতার অমোঘ প্রতিষেধক পরীক্ষা পাশের নোট, "Made-Easy" ইত্যাদি,—এক কথায়, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যে মনের বিকাশকে সুনিশ্চিতভাবে রোধ করে এবং আমাদের 'ভদ্রলোকের

ছেলে'-দের জীবন সংগ্রামের একান্ত অনুপযুক্ত করে তোলে সে কথা দুর্মুখরাও স্বীকার করবেন। প্রয়োজনীয় পরমুখাপেক্ষী দাস মনোবৃত্তি তাই সহজেই গড়ে ওঠে।

কেরাণী জীবনের মূলমন্ত্র "চলো নিয়ম মত।" গতানুগতিকতার কোন বিচ্যুতি চলবে না। অনেকে বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে লাল রঙকেই ধরেন, মত পার্থক্য সত্বেও রক্তপতাকাই সমাজ-বিপ্লবপন্থী অধিকাংশ দলের নিশান। তাই বুঝি কেরাণীর এত লালাতঙ্ক! লালাতঙ্ক ছাড়া, পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছানর জন্য সামান্য লাল পেন্সিলের একটা দাগের বিভীষিকার আর কোন ব্যাখ্যা চলে না। যে বাঙালীর (বা ভারতবাসীর) সময় জ্ঞানের অভাব বিশ্ববিখ্যাত, সেই বাঙালী অফিসের বেলা হলে দুর্ঘটনায় আহত নিজের ভাইকেও হাসপাতালে পৌঁছে দিতে ইতস্তত করবে, অফিসে 'লেট' হয়ে যাবে যে! আপনারা ত অনেক মনস্তত্বের কথা পড়েছেন; বলুন ত, এই ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

মাইক-সংস্কৃতি

পণ্ডিতেরা বলেন, স্থানকালপাত্রভেদে সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক রূপ থাকে, এবং তার কোন বিশিষ্ট চরিত্র অনুযায়ী প্রায়ঃশই সেই সংস্কৃতির নামকরণ হয়। তাই যদি হয়, আমি বলি বাংলার বর্তমান নাগরিক সংস্কৃতিকে তবে 'মাইক-সংস্কৃতি' নাম দেওয়া হোক। কথাটা খুব বেঠিক্ নয়।

ভেবে দেখুন, যে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানে মাইকের অনুপস্থিতি কল্পনাতীত। আমাদের শিল্পীরা ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠেও মাইক ছাড়া গান গাইবার কথায় আতঙ্কগ্রস্ত হন। বক্তৃতা মাইক ছাড়া চলে না। আজকাল দু-একটি শ্রাদ্ধেও নাকি মাইক-সহযোগে মন্ত্র আবৃত্তি করে শোনান হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এমন কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও মাইক ছাড়া অচল। মাইক ছাড়া দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা বা কালীপূজা কল্পনা করুন ত! শহরবাসী হওয়া অবধি যতগুলি পূজা-পার্বণকে মাঝে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম মাইকের দৌলতে ক্রমে ক্রমে সেগুলির আবার প্রচলন হচ্ছে। আগে বিশ্বকর্মাপূজা সম্বন্ধে মিল-ফ্যাক্টরীর কর্মচারী বা কর্মকারেরা ছাড়া আর কেউ বেশী সচেতন ছিলেন না। গত দুই-তিন বছর ধরে মাইকের দৌলতে বিশ্বকর্মা-পূজা সার্বজনীন হয়ে গেছে। হাসপাতালেও আজকাল তিন দিন ধরে মাইক চলে!

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের প্রতীক মাইক। আপনারা সকলেই শুনেছেন, বাঙালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বুদ্ধি। এদেশে বুদ্ধির বড় কদর। কায়িক পরিশ্রম যারা করে তারা 'ছোটলোক'! স্কুল-কলেজে যাঁরা পড়েছেন তাঁদের সকলেরই মনে আছে, খেটে পড়া-শুনো করাকে তাঁরা কি রকম লজ্জাকর বলে মনে করতেন। যদি বা কেউ একটু পড়াশুনা করেও থাকেন, তিনি সে কথা সহপাঠীদের কাছে ঢাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; কারণ, খেটে পড়াশুনা

করে ভাল ফল করলে কোন কৃতিত্ব নেই, তাতে শুনতে হয়—'ও রকম গাধার মতন খাটলে সবাই ফার্ষ্ট হতে পারে', আর ফেল করলে,—নিঃসংশয়ে 'গবেট'। পরিশ্রম করবে 'উড়ে-মেড়ো-খোট্টা'রা! আমরা বাঙালীরা ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরা মাষ্টারমশাইদের লেখা নোটবই মুখস্থ করে কত সহজে পাশ করে যাই! শুধু শুধু 'গাধার মত' খাটব কেন? বলতে পারেন এটা ফাঁকি দিয়ে পাশ করা, কিন্তু আমার বক্তব্য, এই ফাঁকি দেওয়ার কৌশলই আমাদের এক মহৎ গুণ। বুদ্ধি না থাকলে কি কেউ ফাঁকি দিতে পারে?

মাইক হচ্ছে ফাঁকির প্রতীক। সেকেলে গুণীরা (গুণী বটে, কিন্তু 'বুদ্ধু') সঙ্গীত সাধনা বলে একটা কথার প্রচলন করেছিলেন। সঙ্গীতবিশারদ হ'তে গেলে প্রাণান্তকর খাটতে হ'ত! 'নেড়ে' আর 'মেড়ো'রা এখনও খাটে। অথচ বাঙালী 'আর্টিষ্ট'দের তুলনায় তারা সংখ্যায় কত নগণ্য। অলিতে-গলিতে আমাদের আর্টিষ্ট! ওরা মাইকের কদর জানে না বলেই না এখনও অমন 'গাধার' মতন খাটছে! মাইকের দৌলতে কণ্ঠসাধনার কোন প্রয়োজন আমাদের হয় না। বাংলা আধুনিক-সঙ্গীত বাংলার মাইক সংস্কৃতির এক অনবদ্য অবদান, বাঙালী-বুদ্ধির অপূর্ব এক নিদর্শন। পদরচনা থেকে আরম্ভ করে গান গাওয়া অবধি রচয়িতা, সুরকার, গায়ক, কাউকেই কখনও বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। শুনেছি কোন কোন রচয়িতার কাছে 'চাঁদ,' 'চামেলী', 'ব্যথা' 'বিরহী' ইত্যাদি অনেকগুলি দরকারী শব্দ লিষ্টি করা তৈরী থাকে। আমাদের আধুনিক গানের 'শিল্পী'রা তাঁদের ফরমায়েস করামাত্র রচয়িতা কতকগুলি শব্দ একত্র করে গান রচনা করে দেন। সুরকারদেরও কাজ সহজ। ফিল্মের দৌলতে অনেক রকম সুর প্রায় তৈরীই পাওয়া যায়। তাছাড়া, অনেক সুরকারের কাছেই বিলিতি গানের বাছাই রেকর্ড আছে। বুদ্ধি থাকলে নূতন

সুরসৃষ্টির জন্য আর খাটতে হয় না। গায়কদের কথা ত বলার প্রয়োজনই করে না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। বাংলা সাহিত্যে এটা রম্য রচনার যুগ। কোনরকমে কলম ঘষে কতকগুলি শব্দ ছেড়ে দিলেই হ'ল। সব রম্যরচনা সম্বন্ধে অবশ্য কথাটা খাটে না। কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যেই (আজকাল 'সাহিত্য সাধনা' কথাটা শোনা যায় না) সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রবণতা বড় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই মনোবৃত্তি।

কলারসিক নই, কিন্তু এ সন্দেহ সম্ভবত অমূলক নয় যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে একই ফাঁকি বা পরিশ্রম-বিমুখতার যুগ বা হুজুগ চলেছে। ফিল্মেও অন্যথা নয়। কোনরকমে যে কোন সস্তাদরের একটি গল্প জোগাড় করে বাছা বাছা কয়েকটা শব্দ সংলাপ জুড়ে দিয়ে, গান ঠেসে দাও; প্রধান ভূমিকায় বিখ্যাত অমুককুমার আর তমুক দেবী—ব্যস, তারপর দুই একমাস একটা ষ্টুডিও ভাড়া করে ছবি তুলে নাও। টাকা থাকলে ফিল্ম তৈরী করার জন্য আবার খাটতে হয় নাকি?—অধিকাংশ ছবিই এই ফরমুলার ফলিত নিদর্শন।

পেশাদার মঞ্চের অবস্থা ভাল নয়। তার কথা ছেড়েই দিলাম। সখের থিয়েটারের কথা যদি ধরা হয়, তবে একথা বলা চলে যে অল্প কয়েকটি নাট্যসম্প্রদায় ছাড়া অধিকাংশ অভিনয়ই হয় পুরোনো নাটকের ওপর, কারণ, নতুন নাটক সফল করতে হ'লে যে পরিমাণে পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তার জন্য অভিনয়খ্যাতি-কাঙাল অভিনেতারা (বা অভিনেত্রীরা) প্রস্তুত নন। "ষ্টেজে মেরে দেব" কথাটা বাংলায় সার্বজনবিদিত।

খেলাধুলোর ব্যাপারেও 'গা-ঘামান'টা ক্রমশঃ কমে আসছে। আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত। কয়েক বছর আগেও

অধিকাংশ ছেলেই নিজেরা খেলত; আজকাল দেখি অধিকাংশই নিজেরা খেলোয়াড় হবার চেয়ে খেলার সমঝ্‌দার হওয়াটা পছন্দ করে।

জীবিকার ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপার। কায়িক পরিশ্রমের কথা আগেই বলেছি, ব্যবসাও ভদ্রজনোচিত নয়!

উড়িষ্যার অধিবাসীরা 'কৌশল' অর্থাৎ বুদ্ধি কথাটা খুব ব্যবহার করেন। বাঙালীরাও জীবনসংগ্রামে 'কৌশল' করে হেরে যাচ্ছে!

প্রচারনৈপুণ্য আমাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, আর মাইক হচ্ছে প্রচারের প্রতীক। বাঙালীরা নিজেদের সম্বন্ধে যত হাঁকডাক করতে পারে অন্য কেউ তা পারে কিনা সন্দেহ। একথা আপনাকে মানতেই হবে যে প্রচারনৈপুণ্য আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞাপনের কদর কত! যে নাৎসী-জার্মানরা নিজেদের জাতকে (নর্ডিক) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত বলে দাবি করত (এবং প্রচারও করত), সেই সভ্যতম জাত প্রচারসচীব গোয়েবলস্‌কে কত উচ্চে স্থান দিয়েছিল তা আপনাদের জানা। কাজেই দেখুন, প্রচারনিপুণ বাঙালীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর চেয়ে সভ্যতায় উন্নততর।

পাড়ায় আপনারা পুজো করছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মস্ত বড় লাল শালুতে তার বিজ্ঞাপন। পাছে তাও লোকের চোখে না পড়ে, তাই দিবারাত্র মাইক সহযোগে গান শুনিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পূজাকমিটির কর্মকর্তারা কেন মোটা মোটা চাঁদা দেন তা জানেন ত আপনারা।

দানধ্যান নাকি লোকে আগে অগোচরে করত। এখন তা' অবিশ্বাস্য। খবরের কাগজে ক্ষুদে নেতাদের বিবৃতি দেবার ঘটাকে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি বলব। তারপর ধরুন আপনার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ বিখ্যাত বা 'বড়লোক' আছেন। এটা অনায়াসে

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একথা আপনার বন্ধুবান্ধব, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, পরিচিত, সহকর্মী, মায় আপনার অফিসের পিওনটা পর্যন্ত জানে। মাইনে আমার দেড়শ' টাকা, কিন্তু আমার হাবভাবে পোষাকপরিচ্ছদে সবাইকে বুঝিয়ে দেব আমি কম্‌সে-কম চারশ' টাকা পাই। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকর্মে আমাদের জাঁকের পেছনে এক মনোবৃত্তিই কাজ করে। নিজেকে জাহির করা।

বেশী আর লিখব না, লোকে হয়তো বলবে লেখাটার জন্য আমি পরিশ্রম করেছি—খোট্টা বলে আমায় গালাগাল দেবে। কাজেই সরাসরি আমার প্রস্তাব উত্থাপন করি।

এই কিছুদিন আগেই সরস্বতীপূজা হয়ে গেল। আবার এর পরেও বছর-বছর হবে, সেই কথা মনে রেখেই আমার এ প্রস্তাব। সরস্বতী শুধু বিদ্যা বা জ্ঞানের দে ন'ন। তিনি সমস্ত কলাশিল্প, এক কথায় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে পূজিতা হ'ন। যে হাঁসটি সরস্বতীর বাহন, তার কোন সার্থকতা ত দেখতে পাই না। বাংলার সংস্কৃতি যখন এতটা 'মাইক'নির্ভর বা মাইকসর্বস্ব তখন বাংলাদেশে সংস্কৃতির দেবীকেও মাইক-বাহনা করে পূজো করা হ'ক। অমায়িকতাকে আমরা যখন সর্বক্ষেত্রেই পরিহার করছি তখন আশা করি বাংলা সংস্কৃতির ধারক-বাহক-সেবকেরা স'মাইক' সরস্বতী বানাবার জন্য কুমোরপাড়ায় ফরমাস দেবেন। তাতে বাংলার বর্তমান সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রজয়ন্তী

সারা বৈশাখমাসব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তীমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি বর্ত্তমানে বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধূম পড়ে গেছে। সারা বছর ধরে এদেশে এত অনুষ্ঠান হয় যে, অনুমান, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এত প্রাচুর্য নেই।

আপাতদৃষ্টিতে এই সাংস্কৃতিক সচেতনতা অনেকের কাছেই গৌরবের বলে মনে হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এই গৌরব কতখানি টি ঁকবে সে বিষয়ে সংশয় জাগে। এই অনুষ্ঠান উদ্যোগের পেছনে সাংস্কৃতিক সচেতনতা আদৌ সক্রিয় কিনা, কিম্বা এগুলি কি পরিমাণে হুজুগ বা অসুস্থ আত্মপ্রচার-প্রবণতার অভিব্যক্তি, তা বিচার করার সময় আজ এসেছে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে যে অনুষ্ঠানগুলি বর্ত্তমানে চলে, তাদের স্বরূপ কি ? কয়েকটা গান, নাচ আর আবৃত্তি, একটা বা নৃত্যনাট্য এবং সূচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর এক বা একাধিক গতানুগতিক বক্তৃতা—যা নেহাৎ না থাকলে বুঝি ভাল দেখায় না, কিন্তু তা যে একান্ত অনাকাঙ্খিত এ বিষয়ে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়পক্ষই একমত (একথা বোঝা যায় বক্তার জবাবদীহিতে, আর শ্রোতার অধৈর্যে)। এই হল অনুষ্ঠানের চেহারা। এই গান বা কবিতাগুলি যে উদ্যোক্তা বা পরিবেশকের কাছে কোন গুণগত স্বীকৃতির ফলে পরিবেশিত হয় একথা মানতে আমরা রাজী নই। নিতান্তই রবীন্দ্রজয়ন্তী,—আর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা গান আর কবিতাও যখন লিখে গিয়েছেন, তখন রেওয়াজ-অনুযায়ী তাঁর গান ও কবিতাই পরিবেশন করা উচিত! রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ফরমায়েস অনুযায়ী দু-একটা ফিল্মীগানা বা তথাকথিত আধুনিক গানও কোথাও কোথাও পরিবেশিত হ'তে আমরা শুনেছি।

অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও কি খুব সাংস্কৃতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন? গান শুনতে সবাই ভালবাসেন। পাড়ায় জলসা (হিন্দী 'তামাশা' শব্দটিই এখানে ঠিক খাটে) হচ্ছে, যাই শুনে আসি—এই মনোভাব কি অধিকাংশ শ্রোতার মনে প্রধান না? রবীন্দ্র-সংঙ্গীত বা সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন appreciation নিয়ে কজন শ্রোতা এই জলসাগুলিতে আসেন?

উদ্যোক্তা কারা? রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা পাড়ার সব অনুষ্ঠানেরই সরকারী উদ্যোক্তা—পাড়ার দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা থেকে সুরু করে রাজকাপুর সম্বর্ধনা সভার অয়োজন এরাই করে থাকে। মোড়ের চায়ের দোকানে এদের একাংশের উপস্থিতি অত্যন্ত অপ্রীতিকরভাবেই পাড়ার মহিলারা অনুভব করেন।

এই যদি অবস্থা হয় তবে সংস্কৃতি সচেতনতা-কোথায়?

বরঞ্চ মনে হয় রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলি বর্ত্তমান বাংলার সর্বব্যাপী হুজুগপ্রিয়তারই আর একটি অসুস্থ প্রকাশ। যে হুজুগের অতিশয্যে আমরা মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখার জন্য তিনদিন আগে থেকেই 'কিউ'তে দাঁড়াই, যে হুজুগে আমরা নতুন ফিল্মের (বিশেষত হিন্দী ছবি) উদ্বোধনীতে নায়ককে সশরীরে দেখবার জন্য প্রেক্ষাগৃহের সামনে ভিড় করে রাস্তা 'জাম' করে দিই, যে হুজুগে 'লারে-লাপ্পা' গানের একান্ত অনুরাগী ভক্তরা সারা-রাত হিমেল ফুটপাথের উপর বসে (বা শুয়ে) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনার নাম করে ঝিমোন, সেই হুজুগেই আমরা আজকাল রবীন্দ্র-জয়ন্তী তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মাতামাতি করছি। আত্ম-প্রচারও (উদ্যোক্তাদের পক্ষে প্রযোজ্য,—এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রোতাদের চেয়ে উদ্যোক্তাদেরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়) যে এই অনুষ্ঠানগুলির পিছনে একটা প্রধান প্রেরণা সে বিষয়েও বোধ হয় অনেকেই একমত হবেন।

বর্তমানে তথাকথিত রবীন্দ্রজয়ন্তী বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে অন্তঃসারহীন হুজুগ এবং অসুস্থ আত্মপ্রচারপ্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি, তা মূলত সমাজসমস্যা।

সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকায় অস্থির সমাজমানস আদর্শহীন জীবনসংগ্রামে বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত। গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির বিলুপ্তির মুখে যুগসম্মত মূল্যবোধসমষ্টি এখনও দানা বেঁধে ওঠে নি। আমাদের বিচার-বিশ্বাসের ভিত্তিমূল এখনও সামন্ততান্ত্রিক, কিন্তু আচারের বহিরঙ্গে আমরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় বিপুলভাবে প্রভাবিত এবং সেই প্রভাব আমাদের বিচার-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে একথাও সত্য। তাই রূপান্তরমুখী সমাজ-মানসের অন্তর্নিহিত বিশৃঙ্খলা ছাড়াও পাশ্চাত্ত্যের মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশান্তির অংশীদারও আমরা হয়েছি।

আধুনিক নগরসভ্যতায় আনন্দের উপকরণের প্রাচুর্য থাকা সত্বেও আনন্দের একান্ত অভাব আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি।* এ যুগে, বিশেষত নগরে, আনন্দের উপকরণ অসংখ্য এবং অনায়াসলভ্য। কিন্তু তাতে আমরা আনন্দ পাই না, কেননা বিশৃঙ্খল মানস আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত নয়; নাগরিক আমোদ প্রমোদ অনায়াসলভ্যতায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের আনন্দদায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে। বৃথাই আনন্দলাভের মরিয়া প্রয়াসে সমাজ-মানস উপকরণ থেকে উপকরণান্তরে ছুটোছুটি করে ব্যর্থকাম শেষ প্রয়াসে একদিকে যেমন পুরাতন উৎসবাদির মধ্যে আনন্দের সন্ধান করে, তেমনি অন্যদিকে নূতন উৎসব সৃষ্টিরও প্রচেষ্টা করে। রবীন্দ্রজয়ন্তী এইরূপ একটি নূতন উৎসব রবীন্দ্রজয়ন্তীর মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক বীরপূজার প্রবণতা বা অন্যান্য কারণ অস্বীকার না করেও একথা সহজেই বলা চলে

* 'একালের ধর্মীয় উৎসব' দ্রষ্টব্য।

যে রবীন্দ্রজয়ন্তীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে আনন্দ-বন্ধ্যা সমাজে উৎসব সৃষ্টির প্রয়াসই সবচেয়ে বেশী প্রকট। কিন্তু পরিবর্তনমুখী আমাদের সমাজের অস্থির পরিস্থিতি উভয় প্রয়াসকেই বাধাহত করেছে স্বভাবতই। পুরাতন মূল্যবোধের বিলুপ্তির মুখে পুরাতন উৎসবগুলি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে, আধুনিক মন আনন্দের সার্থকতা সেখানে খুঁজে পায় না। অন্যদিকে যে-বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রচলন হচ্ছে, তাতে যেন মন ভরে না। কারণ আমরা কি চাই সে প্রশ্নে যতক্ষণ না নিঃসংশয় হ'তে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্তি সুদূরপরাহত।

আনন্দকামী মনের উপরোক্ত দিশাহারা প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি হ'ল যাকে আমরা বলি হুজুগ। সুনিশ্চিত-লক্ষ্য সুস্থির মনে হুজুগের কোন স্থান নেই। আগন্তুক যুগের সহচারী মূল্যবোধ সমষ্টি সুস্থিত হ'লে সমাজ-মানসে হুজুগের স্থান অনেক সংকুচিত হয়ে যাবে এ আশা অলীক নয়।

যে আত্মপ্রচার-প্রবণতা আমরা রবীন্দ্রজয়ন্তী তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে লক্ষ্য করেছি তা আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের ব্যক্তি-সর্বস্বতারই অন্যতম অভিঃপ্রকাশ। আমাদের বর্তমান বর্ণসংকর সভ্যতায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিক যতই অপূর্ণ বা অগঠিত হোক না কেন পাশ্চাত্যের ভাবধারার সূত্রে ধনতান্ত্রিক মানসিকতার এই দিকটি আমাদের নগরসমাজের মজ্জায় প্রবেশ করেছে। এই ব্যক্তিসর্বস্বতা ধনতান্ত্রিক সমাজধারার অনিবার্য পরিণতি। ধনতন্ত্রের প্রাথমিক বিকাশের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য ছিল—ব্যক্তিস্বাধীনতা বৈষয়িক প্রতিযোগিতার (Competition) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি-স্থাপক হ'ল এই বৈষয়িক প্রতিযোগিতা। বৈষয়িক প্রতিযোগিতামূলক এই ধনতন্ত্রই কিভাবে

একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়, তা আমরা দেখেছি। তেমনি এই একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরিণতি লাভ করেছে ব্যক্তিসর্বস্বতায়। কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) তাঁর অনবস্থ বিশ্লেষণে বলেছেন,

> "...Unbridled compitition has also effect of taking him (man) out of his social milieu breaking up family ties and generally tending to isolate him to such an extent that he nearly becomes asocial. This is when competitive :pattern gain such a hold on the minds of people that it undermines their whole character. No longer does it affect only part of a man's behaviour, but it changes the whole personality pattern of the participants of social drama" ('Freedom Power and Democratic Planning'—Chap IX).

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রতিযোগিতা এইভাবে শুধু সমাজের বৈষয়িক ভিত্তিমূলই নয়, গোটা সমাজকেই রূপান্তরিত করে দিচ্ছে—এমনকি মানুষের ব্যক্তিত্বকেও করে তুলেছে ভিন্নতর। মানুষের আত্মীয়তার এবং পরিবারের গণ্ডী সংকুচিত হ'তে হ'তে প্রায় বিলুপ্ত হ'তে চলেছে ; উপকরণ-সর্বস্ব 'Brave New World'-এর কল্পনা আজ বাস্তবের সীমান্তে উপনীত। সম্পূর্ণ সমাজ-বিচ্ছিন্ন না হলেও মানুষ হয়ে উঠেছে অসামাজিক (asocial), আত্মসর্বস্ব। এই আত্মসর্বস্বতায় মানুষ শুধু সামাজিকভাবেই খণ্ডিত এবং সংকীর্ণতর হচ্ছে তা নয়, তার নিজস্ব সত্তাকেও খণ্ডিত করছে চূড়ান্তভাবে। আধুনিক মানুষের সত্তা অনেকাংশেই বিচ্যুত।

এই সত্তা-বিচ্যুতি (alienation) অবশ্য সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই সুরু। মানুষ নিজের জীবনের অপরিপূর্ণতা সম্বন্ধে মর্মান্তিকভাবে সচেতন। তার কামনা বাসনার সম্পূর্ণ চরিতার্থতা

লাভ অসম্ভব। এমনকি আত্মবিকাশের (self-expression) পূর্ণতাও জীবনে সে পায় না। কোন মানুষই তার আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে পারে না। তাই সে তার আদর্শ গুণ-সমষ্টি দিয়ে বিভিন্ন প্রতীকের (Symbol) সৃষ্টি করে নিজের পূর্ণতা খোঁজে। ঈশ্বর, দেব-দেবী, অথবা পুরাণের (mythological) নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি কতকটা এইভাবেই। শুধু দেবতা নয়, মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institutions) সমাজ-ব্যবস্থা, আইন-কানুন থেকে আরম্ভ করে তার দৈনন্দিন কর্ম * পর্যন্ত মনুষ্য-জীবনের সর্বস্তরে বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে আপন সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষ বর্তমানে প্রায় ব্যক্তিত্বশূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। ক্রমশ মানুষ তার নিজের সৃষ্ট এই প্রতীকের কাছে সম্পূর্ণ কবলিত হয়ে পড়েছে। মানুষের এই সত্তাবিচ্যুতি আজ চরমে উঠেছে। এরিক ফ্রোম (Eric Fromm) বলেন—

> "Alienation as we find it in modern society is almost total; it pervades the relationship of man to his work, to the things he consumes, to the state, to his fellow man, and to himself. Man has created a world of man-made things as it never existed before....the more powerful and gigantic the forces are which he unleashes, the more powerless he feels himself as a human being." ('The Sane Society'. P. 125)

আপনার সৃষ্ট প্রতীকের মধ্যে মানুষের এই সত্তা-বিচ্যুতির পরিণতিতে আধুনিক মানুষ এক অদ্ভুত শূন্যতা বোধ করে। এই শূন্যতাবোধ তাকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে। সে তার কবল থেকে

---

* আধুনিক শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থায় (Division of Labour) ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষ যে কাজ করে তার সঙ্গে মানুষের কোন আত্মীয়তা নেই, সে যে-বস্তুর উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তার স্বত্ব-স্বামীত্বের কোন দাবি সে কল্পনাও করে না। তার উৎপাদিত অংশের পরিণতি বা সার্থকতা সম্বন্ধে পর্যন্ত প্রায়শঃই সে অচেতন।

মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটোছুটি করছে। সে আত্মগত থাকতে পারে না, তার কিছু না কিছু সঙ্গ চাই। সে সান্নিধ্য খোঁজে কাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, হুজুগের মধ্যে, স্ফূর্ত্তির মধ্যে, কিম্বা নিজ সৃষ্ট অন্য কোন প্রতীকের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ জীবনকে, সময়কে উপভোগ করার কথা ভুলতে বসেছে। তার লক্ষ্য কোন রকমে "সময় কাটান" ('to kill the time')। কাজ না থাকলে সময় কাটাতে সে সিনেমাতে যায়, তাস খেলে, বই পড়ে বা যান্ত্রিক গান শোনে। অন্য কিছু না হোক অন্ততঃ একটা সিগারেটের সঙ্গ চাই। একলা সে থাকতে পারে না, আত্মগত সে হতে পারে না ; কারণ তার একলার মধ্যে আর অবশিষ্ট প্রায় কিছুই নেই, সেখানে শূন্যতা অক্টোপাসের মত তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তাই সে চায় পালাতে। অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নতুন হুজুগের মধ্যেও মানুষ আশ্রয় খোঁজে এই শূন্যতার থেকে পরিত্রাণের আশাতেই।

বাইরে তার গণ্ডী যতই ক্ষুদ্র হয়ে আসছে, অন্তরে তার সত্তা যতই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, ততই মানুষ নিজের অস্তিত্বকে আপনার কাছে এবং জগতের কাছে স্বীকার করিয়ে নিতে উদগ্র-প্রয়াসী হয়ে উঠছে। তাই আত্মপ্রচার এ যুগের ধর্ম্ম অবশ্য আত্মপ্রচার যে অন্য কোন যুগে ছিল না একথা বলা চলে না, কিন্তু এ যুগের মূল্যবোধে আত্মপ্রচার যেভাবে স্বীকৃত অন্য কোন যুগে তা' ছিল কিনা সন্দেহ। রাজ-রাজড়ার আড়ম্বর, কীর্ত্তিপ্রচার প্রভৃতিকে সামাজিক অর্থে আত্মপ্রচারের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত হবে না। আলোচনাসাপেক্ষ হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে রাজগৌরবে জনসাধারণ আত্মগৌরবই অনুভব করত। কিন্তু এখানে সে আলোচনা অবান্তর।

স্বভাবতই আত্মপ্রচারকে অসুস্থ মানসিকতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা চলে। আত্মবিকাশ আর আত্মপ্রচার এক নয়।

আত্মবিকাশ পূর্ণতার সাক্ষ্য বহন করে, আত্মপ্রচার অপূর্ণতার দৈন্য প্রকট করে। আত্মবিকাশ যেন বাগানে অনেক ফুলের মধ্যে অরেকটি ফুল ফোটা। সে-ফোটার মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে, সরিয়ে, ডিঙ্গিয়ে নিজেকে জাহির করার অসুস্থ প্রয়াস চোখে পড়ে না, যা আত্মপ্রচারে লক্ষণীয়। আত্মবিকাশের অন্তর্নিহিত সুর, "তোমাদের মধ্যে আমিও আছি ভাই"; আত্মপ্রচার বলে, "তোমাদের চেয়ে আমি কম নই।" নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে হীনমন্যতা থাকলেই আত্মপ্রচার-প্রবণতা দেখা দেয়।

তাই রবীন্দ্রজয়ন্তী বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে দৈন্য, যে অন্তঃসারহীনতা আমাদের পীড়া দেয়,—সংস্কৃতিজগতের যে আশু সমস্যায় আমরা বিব্রত তার সমাধান একান্তভাবেই সমাজবদলের সঙ্গে জড়িত। যতদিন পর্যন্ত সেই মূল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেই দৈন্যের অবসান আশাতীত।

সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ আছে এবং সাহিত্যে যে বাস্তবতা অপরিহার্য, একথা ক্রমশঃই ভাববাদী প্রতিবাদ ডিঙ্গিয়ে প্রায় স্বীকৃত হ'তে চলেছে। কিন্তু সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভবত এখনও গড়ে ওঠে নি। যদি বলা হয় যে লেখকের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, লেখা শুধু তার আত্মতৃপ্তি বা আত্মবিকাশেই সীমাবদ্ধ রাখলে তার সাহিত্য খণ্ডিত হয়, তবে কথাটাকে হয়ত অনেকেই আল্‌গাভাবে মেনে নেবেন; কিন্তু যথাযথভাবে ক'জন একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এই দায়িত্ব কি, এবং দায়িত্বপালনের মাপকাঠিই বা কি—এই প্রশ্নগুলি সাহিত্যিকের পক্ষে, বিশেষত প্রগতিবাদী লেখকের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

সংসারের অন্যান্য যাবতীয় কর্মের মত সাহিত্যসৃষ্টিও একটা কর্ম এবং এই অর্থে সাহিত্যিকও কর্মী এবং চাষী ও মজুরের সঙ্গে একই শ্রেণীতে এসে দাঁড়ায়। চাষী ও মজুরের বেলায় যেমন সাধারণ পণ্যবস্তু, তেমনি সাহিত্যিকও সাহিত্যকে বর্তমানের সামাজিক কাঠামোতে অনেকাংশে পণ্যবস্তুরূপেই হাজির করে। চাষী-মজুরের যেমন দায়িত্ব হ'ল জনসাধারণের খোরাক মেটান, কর্মী হিসেবে গণমানসের পুষ্টিসমৃদ্ধি, জনসমাজের মনের খোরাক জোগানোই তেমনি সাহিত্যিকের প্রাথমিক সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বপালনে অক্ষম হ'লে, সাহিত্যে ভেজাল বা অখাদ্য সৃষ্টি করলে, সেই সাহিত্য কখনই সৎসাহিত্যের শ্রেণীতে পড়তে পারে না।

এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সমাজ-সচেতনতার। সমাজচেতনার অর্থ এই না যে, প্রত্যেক সাহিত্য-সৃষ্টিতেই সমাজের কথা থাকবে, যেমন সব কবিতার মধ্যে সমাজের ছবি থাকতে পারেনা; অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

সামাজিক সমস্যাবলীর গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু কবিতায়ই হোক, বা প্রবন্ধেই হোক যে-সাহিত্যে সমাজমানসের যোগসাধন ঘটবে না, সেই সাহিত্যসৃষ্টি ব্যর্থ।

সমাজ-চেতনার তিনটি অঙ্গ—দেশ-চেতনা, কাল-চেতনা এবং পাত্র-চেতনা।

দেশ-চেতনা ঃ

দেশকে (অথবা স্থান-কে) জানতে হবে, বুঝতে হবে ; দেশের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে, জনসাধারণের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং স্বভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। না হলে সাহিত্য ভাসাভাসা এবং জোলো হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাহিত্যে সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। বিদেশের সাহিত্য এমন কি ঘটনাবলীও অন্যদেশের সাহিত্যে ছাপ ফেলে। একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। তেমনি ফরাসীবিপ্লব, রুশিয়ার বিপ্লব প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

কাল-চেতনা বা যুগ-চেতনা ঃ

যুগচেতনাও সাহিত্যের আবশ্যিক অঙ্গ। সমাজ অচলায়তন নয়। উৎপাদন-সম্বন্ধের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোতে বিভিন্নকালে সামাজিক মূল্যবোধ, মেজাজ,—এক কথায় সমাজ-মানসই বদলে যায়। তাই একযুগের আবেদন অন্যযুগে শিথিল হয়ে আসা স্বাভাবিক। অবশ্য একথাও বলা ঠিক নয় যে একযুগের সাহিত্য অন্যযুগে অচল। বহু সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির আবেদন হয়ত বা চিরন্তন থেকে যায়।

পাত্র-চেতনা বা গণ-চেতনা ঃ

সমাজের সব মানুষের রুচি, মত, বিশ্বাস, প্রবণতা এবং বিচার-বোধ এক রকমের হয় না। বিশেষত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন

শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্যও থাকবে প্রচুর। তাই প্রশ্ন ওঠে সাহিত্য কার জন্য লেখা হবে। সূত্রপাতে সাহিত্য সামাজিক ছিল এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে সকলেরই হাত ছিল। আমাদের দেশে কিছুকাল আগেও গ্রামে মুখে মুখেই সাহিত্যসৃষ্টি হ'ত, এবং মুখে মুখেই তা ছড়িয়ে পড়ত। এটা প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। উগ্র-ব্যক্তিবাদের যুগেই সাহিত্য সমাজ থেকে পৃথক হয়ে এসে আত্মগত হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের এই আত্মগতি প্রায় সাহিত্যিক আত্ম-রতিতে পর্য্যবসিত হতে চলেছে; বিশেষত আধুনিক কবিতায় এই লক্ষণ স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, এই আত্মরতি কখনই মানসিক সুস্থতার পরিচায়ক নয়। ক্রমশঃ সাহিত্য জনসমাজের মুষ্টিমেয় একাংশের মধ্যেই সীমায়িত হয়ে পড়ে। ধনতন্ত্রের অন্তিম অবস্থায় সাহিত্য আবার সাধারণের মুখোমুখী হয়েছে। স্বভাবতই পাত্রভেদে সাহিত্যের চরিত্রও বদলাতে হবে। এই সূত্রে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে গণসাহিত্য সৃষ্টি করা খুব সহজ নয়। সাহিত্য এখনও বুদ্ধিজীবীদের কুক্ষিগত। লেখকের মানসিক শ্রেণী-বিচ্যুতি (psychological de-classification) সহজ নয়। সহানুভূতি বা দরদ আর আত্মীয়করণ এক জিনিষ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত লেখক মজুর, চাষী তথা মেহনতী জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম না হ'তে পারেন ততদিন পর্যন্ত তার সাহিত্য সত্যিকারের গণ-সাহিত্য হয়ে উঠবে না। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যিকগণের পক্ষে তা' কতখানি সম্ভব সেকথা বিবেচনাসাপেক্ষ। তা' সত্বেও একথা মানতে হয় যে সাহিত্যকে ক্ষুদ্র শ্রেণীসাহিত্যের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে ক্রমশঃ সার্বজনীন করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য লেখাকে প্রথমেই সাধারণের বোধ্য করে তুলতে হবে। ভাব ও আঙ্গিকের কসৃরতীতে রচনাকে সাধারণের দুর্বোধ্য করে তোলায় আত্মম্ভরিতার তৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু তাতে সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্যে এই কালোয়াতী

মনোভাব বিকৃত ধনতন্ত্রযুগের উগ্র ব্যক্তিবাদেরই প্রতিফলন মাত্র।

দেশকালপাত্র ভেদে সমাজমানসের রূপায়ন এবং প্রতিফলন সাহিত্যের কর্ত্তব্য। আমরা যেমন আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে প্রয়োজনবোধে বেশবাস ঠিকঠাক করে নিই, সমাজের পক্ষেও তেমনি আয়নার প্রয়োজন, এবং সাহিত্যই সেই আয়নার কাজ করে। সামাজিক মূল্যবোধসমষ্টিই সমাজের বেশবাস। সাহিত্য যে সামাজিক মূল্যবোধ সমষ্টির হেরফের করতে যথেষ্ট সাহায্য করে তা'তে সন্দেহ নেই। সমাজমানসের সঠিক প্রতিফলনের জন্য সাহিত্যিককে বাস্তবনিষ্ঠ হ'তে হবে। বলা বাহুল্য, সমাজ-মানসের রূপায়নের জন্য সমাজচেতনার প্রয়োজন আরো বেশী। কারণ প্রতিফলনকে সরস ও সজীব করে তুলতে না পারলে তার রূপায়ন সম্ভব না। সমাজে বহু সমস্যা আছে, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন গুণও থাকে। সাহিত্যের কর্ত্তব্য তাদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট গুণ বা সমস্যা নির্ব্বাচন করে, সেই সমাজ বা সমাজ-মানসকে রূপায়িত করে তোলা—তার স্বকীয় চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজচেতনা না থাকলে ভূয়ো সমস্যার আবির্ভাব ঘটে, বা সমাজের অপ্রয়োজনীয় দিকে আলোকসম্পাত করা হয়, যার ফলে সেই সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজমানসের উপযুক্ত রূপায়ন ঘটে না।

তা ছাড়া, সমাজমানসের সমৃদ্ধিসাধন সাহিত্যের অন্যতম কর্ত্তব্য এবং সাহিত্য স্থষ্টির সার্থকতা সমাজপ্রগতির সহয়তায়। নূতন চিন্তাধারা গঠনে নূতন মূল্যবোধের স্থষ্টিতে সমাজমানস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সাহিত্যের মাধ্যমে। আবার, সমাজ যে এগিয়ে চলেছে একথাও সুনিশ্চিত। হতে পারে সে অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন নয়,—এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে গবেষণার অন্ত নেই, কিন্তু যে-কোন মূল্যমানেই বিচার করা যাক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে আদি-

মানবগোষ্ঠী বা জেঙ্গিস খাঁর সমকালীন সমাজের তুলনায় বিংশ-শতাব্দীর মানবসমাজ নিঃসংশয়ে এগিয়ে এসেছে। সমাজবিজ্ঞান এর সাক্ষী। তাই প্রসঙ্গত একথা বলা চলে যে, যে-সাহিত্য অতীতপূজার আতিশয্যে অতীত সম্বন্ধে অহেতুক মোহ এবং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবজ্ঞার সৃষ্টি করে, সেই সাহিত্য-বিলাসকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া অনুচিত নয়। অবশ্য ভবিষ্যৎগঠনে অতীতের কাছে আমরা যে শিক্ষা বা সাহায্য পাই তা' গ্রহণ করতেই হবে। বলা বাহুল্য, সমাজমানসের সমৃদ্ধি-সাধনও সমাজ চেতনার উপর নির্ভরশীল।

সমাজমানসের খোরাক জোটান ছাড়াও সাহিত্যের অন্যতম দায়িত্ব হ'চ্ছে সমাজ-মানসের বিপর্যয় এবং প্রত্যাগামিতা (Regression) রোধ করা। সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক জীব মাত্রেরই স্বীয় স্বাভাবিক বৃত্তির (instinct) নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সামাজিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে সামাজিক সূত্রে আহৃত বৃত্তিগুলি বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং প্রায়শঃই স্বভাব পশ্চাদ্‌মুখী হয়। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ একে সমাজমানসের প্রত্যাগামিতা বলে বিবৃত করেছেন। ব্যক্তিজীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার লোপ ব্যক্তি-মানসে যেমন প্রত্যাগামিতার সৃষ্টি করে, তেমনি মোটামুটিভাবে সমাজ-মানসেও এই প্রত্যাগামিতার উদাহরণ পাই। জার্ম্মানিতে নাৎসীবাদের সার্বজনীন আবেদন, ভারতবর্ষে ১৯৪৬,৪৭-এর উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সামাজিক প্রত্যাগামিতারই উদাহরণ। প্রাণীসমাজেও প্রত্যাগামিতা পরীক্ষিত ঘটনা। মৌমাছিদের নিয়ে R. Brun * এবং Von H. Buttel Reepen-এর গবেষণা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। †

---

* International Journal of Psychoanalysis, Vol. I 1920 P. 346.

† Karl Mannheim প্রণীত 'Man and Society In An Age of Reconstruction'-Chapter III. দ্রষ্টব্য।

আমাদের সমাজ এখন রূপান্তরমুখীন। এই পরিবর্ত্তনের মুখে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধসমষ্টি ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথচ নূতন মূল্যবোধ-সমষ্টি এখনও গড়ে ওঠে নি। স্বভাবতই সমাজমানসে একটা ফাঁকের (Gap) সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় সমাজ-মানসকে সুপরিচালিত করতে না পারলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং সমাজমানসে পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এইখানেই এসে পড়ে সাহিত্যিকের দায়িত্ব—নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব, সমাজ-মানসকে পথনির্দ্দেশের দায়িত্ব। প্রধানত তাকেই এই দায় বহন করতে হবে। রাজনীতিকগণের দায়িত্ব মূলতঃ রাজনৈতিক কাঠামোর গঠন-পোষন এবং প্রয়োজন হ'লে পরিবর্ত্তনে সীমাবদ্ধ। পূর্ব্বতন সমাজব্যবস্থায় সমাজসংস্কারক বা ধর্ম্মনেতারা সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার দায়িত্ব অনেকাংশে বহন করতেন, কিন্তু আগামী বিপ্লবোত্তর, এমনকি বর্ত্তমান বিপ্লবমুখী সমাজেও তাদের কর্মপরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই এই বিপ্লবমুখী সমাজে সমাজমানসের বিপর্যয় রোধ করে কালোপযোগী নূতন সুস্থ মূল্যবোধ সৃষ্টি করার অলঙ্ঘ্য দায়িত্ব এসে পড়েছে সাহিত্যিকের উপর।

প্রাদেশিকতা

ভারতবিভাগকে যারা নিরঙ্কুশ শুভ ব্যবস্থা বলে স্বীকার না করেন, তারা একথাও মনে করেন যে এই দেশ-বিভাগ ঘটেছিল সাম্প্রদায়িকতার একান্ত বিষময় ফলস্বরূপ। এই সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুদের বেশী আচ্ছন্ন করেছিল, না মুসলমানদের করেছিল, সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে একথা অনস্বীকার্য। আজ সাম্প্রদায়িকতা যদি বা স্তিমিত (হয়ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই), কিন্তু তার স্থান অধিকার করে নিচ্ছে এক নূতন উপসর্গ, যা কোন অংশে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে কম মারাত্মক নয়। প্রাদেশিকতাকে সাম্প্রদায়িকতারই সহোদর বলা চলে, সংকীর্ণ গোষ্ঠিমন্যতা উভয়েরই জননী।

আদি যুগে গোষ্ঠিবদ্ধতা মানুষের জীবন-সংগ্রামে অপরিহার্য কৌশল ছিল এবং তার প্রয়োজন আজও শেষ হয়নি। গোষ্ঠিবদ্ধতার সর্বাত্মক ব্যাপ্তিতে আদিমানবের ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তা একাকার হয়ে মিশে ছিল। গোষ্ঠিবদ্ধতার সেই চিরন্তন অভ্যাসেই এখনও মানুষ যে কোন পার্থক্যে সগোত্রসন্ধান করে; আজ গোষ্ঠিবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু এই প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকলেও গোষ্ঠীর কল্পনাতীত রূপান্তর ঘটেছে। আদি যুগের পারিবারিক গোষ্ঠী একদিকে ক্ষুদ্র গ্রাম্যগোষ্ঠী থেকে জাতিগোষ্ঠী (nation) এবং অন্যদিকে টোটেমিক (Totemic) গোষ্ঠী থেকে ধর্মীয় গোষ্ঠী পর্যন্ত অবিশ্বাস্য বিস্তৃতির মধ্যেও আর সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। শুধু তাই না, মানুষের সমাজসত্তাও আজ বহুধা-বিভক্ত। একই ব্যক্তি একাধারে ভারতীয়, বাঙ্গালী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বেহালা-নিবাসী, ভদ্রলোক, গায়ক, মোহনবাগানের খেলোয়াড়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, কম্যুনিষ্ট এবং সেণ্ট্রাল

ব্যাংকের কর্মচারী হতে পারেন। তার এই বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীতে তার পৃথক অস্তিত্ব আছে (আধুনিক যুগে তার ব্যক্তিসত্তাও অবিচ্ছিন্ন নয়)। এই সব গোষ্ঠী সাধারণত পরস্পরবিরোধী নয়, বরঞ্চ প্রায়শঃই পরিপূরক, যেমন বাঙালী মাত্রই ভারতীয় বা ব্রাহ্মণ মাত্রই হিন্দু। আবার সম্বন্ধহীন গোষ্ঠীতে সব জাতির সর্বধর্মের অথবা সব অফিসের লোক থাকতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সব বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধ না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত গোষ্ঠিসংস্থায় আত্মসনাক্তির কোন সমস্যা দেখা দেয় না, সমস্যার সূচনা হয় বিভিন্ন গোষ্ঠিস্বার্থের সংঘাতে, যেমন ভারতীয় হিসাবে আমার যা' স্বার্থ বা দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালী হিসাবে তার অন্যথা ঘটতে পারে।

মূল প্রশ্নই তাই প্রাথমিক আত্মসনাক্তির, আমি প্রথমে ভারতীয় না প্রথমে বাঙালী। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষের সমাজসত্তার যে বিস্তৃতি ঘটেছে তার প্রভাব সকলের মনে সমভাবে নিহিত হয় নি। দাক্ষিণাত্যের গ্রামে বর্ণের (caste) প্রশ্নে যে উগ্রতা আজও চোখে পড়বে, কলকাতায় তার অভাব থাকাই স্বাভাবিক। আবার কলকাতায় কোন রেস্টুরেণ্টে এক টেবিলে কোন শূদ্রজাতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে যে-ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক খাবার খেতে কোন দ্বিধাবোধ করবেন না, তিনি হয়ত তার ব্রাহ্মণ পাচকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে খাওয়ার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি করবেন। স্পষ্টতই গোষ্ঠিচৈতন্য বর্ণ-গোষ্ঠী (caste) থেকে শ্রেণী-গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

গোষ্ঠিচৈতন্যের এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ভারতীয় বৈষয়িক পরিস্থিতির পটপরিবর্ত্তন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্ম্মের (অর্থাৎ যে অর্থে ইংরেজী শব্দ religion ব্যবহৃত হয়) প্রাধান্য অনিবার্য, কারণ যে-ক্রমপর্যায়ী আনুগত্য এবং বিশ্বাস সামন্ততন্ত্রের

ভিত্তিস্বরূপ তা'ই ধর্ম্মের ধারক ও বাহক, তাই সামন্ততন্ত্র এবং ধর্ম্মের সমান্তরাল অস্তিত্ব অনিবার্য। এই সমাজব্যবস্থায় সব কিছু শেষ পর্যন্ত ধর্ম্মের নামেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষত ভারতবর্ষে সমাজ জীবনের সঙ্গে ধর্ম্ম একাকার হয়ে গিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভারতবর্ষে অটুট ছিল, ততদিন ভারতীয় সমাজে যে গোষ্ঠিবিন্যাস চলে এসেছে, আজ তার ভিত্তি টলে উঠেছে। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। যে আকারেই আসুক ভারতে শিল্পায়ন আসন্ন। বিশেষত ভারতীয় নগরগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সামন্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত (যদিও মানসিকতায় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার থেকে সকলে এখনও মুক্ত হতে পারেন নি)। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে গণ্ডিবদ্ধতা স্বাভাবিক, এমন কি প্রয়োজনীয়, ধনতন্ত্রের বিকাশে সেই গণ্ডিবদ্ধতাই প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীও তাই অনিবার্য রূপান্তরের মুখে নূতন চৌহদ্দি খুঁজছে—বর্ণগোষ্ঠী রূপান্তরিত হচ্ছে শ্রেণীগোষ্ঠীতে। অবশ্য গোষ্ঠিচৈতন্যের এই রূপান্তর মোটেই সরাসরি ভাবে ঘটছে না। ইতিমধ্যে ধর্ম্মীয় গোষ্ঠিচৈতন্য এবং প্রাদেশিক গোষ্ঠিচৈতন্য তাদের স্ব স্ব ভূমিকায় ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে ছাপ ফেলেছে।

ভারতবর্ষে প্রাদেশিক চেতনা একান্তই আধুনিক। প্রাগার্য ভারতবর্ষে অ-দ্রাবিড় জনসমাজের গোষ্ঠিচৈতন্য টোটেমিক পর্যায়ে ছিল এ অনুমান করা চলে। দ্রাবিড় সভ্যতা নিঃসন্দেহে উন্নত, কিন্তু তার সমাজব্যবস্থার সঠিক চিত্র এখনও লভ্য নয়। তাই প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তখন উঠতেই পারে না। ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগেই অর্থাৎ মুসলমান শাসনকালেই গোষ্ঠিচৈতন্যের ধর্ম্মীয় ভিত্তি সম্ভবত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্পষ্টপ্রাধান্য পায়। ইতিপূর্বে গোষ্ঠিচৈতন্য বর্ণ-ভিত্তিক ছিল (বর্ণ-ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে মিশে গেলেও বর্ণ আর ধর্ম্ম যে সমার্থক নয় একথা মনে

রাখতে হবে[১]।) তারপর থেকে একাদিক্রমে সমস্ত উনবিংশ-শতাব্দী পর্যন্ত এই ধর্ম্মীয় গোষ্ঠিচেতনারই একাধিপত্য। মুস্‌লিম রাজত্বে শাসনের ভিত্তি ছিল ধর্ম্মীয়। এই যুগের বৈষয়িক বুনিয়াদ সামন্ততান্ত্রিক, তার সঙ্গেও ধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই গোষ্ঠি-চৈতন্য স্বভাবতই ধর্ম্মীয় ভিত্তিতেই কায়েমী হয়েছে। বৃটিশ আমলে শাসনের ভিত্তি বাণিজ্যিক হলেও চতুর ইংরাজেরা ধর্ম্মীয় বিভেদকে তাদের শাসন কায়েমী করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করেছে, এবং তারা ধর্ম্মীয় গোষ্ঠিচৈতন্যকে প্রবলতর করার জন্য চেষ্টা এবং ব্যবস্থার কোন ত্রুটীই করে নি।

প্রাদেশিকতা জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতর এবং অনেকক্ষেত্রে বিকল্প রূপ। জাতীয়তাবোধ যে একশ' বছর আগেও ভারতবর্ষে প্রায় অনুপস্থিত ছিল তার প্রমাণ সিপাহীবিদ্রোহের সংগৃহীত তথ্যাবলীর থেকে স্পষ্ট। সিপাহী-বিদ্রোহের মূল প্রেরণা যে ধর্ম্মীয়, এবং আদর্শ যে সামন্ততান্ত্রিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েও বাঙালীদের পরিচয় বা সনাক্তি প্রদেশের ভিত্তিতে উল্লিখিত দেখিতে পাই। সিপাহীবিদ্রোহের সঙ্গে বাঙালীদের, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের অসহযোগের ব্যাপারেই প্রাদেশিক সনাক্তি বৈশিষ্ট্যলাভ করেছে। প্রাদেশিকতা যে বাঙালীদের মধ্যেই প্রথম অনুপ্রবেশ করেছে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবু একথায় লজ্জা পাবার কিছু নেই। প্রাদেশিক চেতনা বা বিকল্প জাতীয়তাবোধ সেকালের বাঙালী শিক্ষিত সমাজের আধুনিকতা তথা প্রগতির পরিচায়ক।

---

(১) বর্ণ শুধুমাত্র ধর্ম্মভিত্তিক, একথায় আপত্তি উঠবে। নিঃসন্দেহে সামাজিক কর্ম্মবণ্টন (division of labour) ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার মূল কারণ। পৃথিবীর নানা দেশে বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার মত চূড়ান্ত রূপ অন্যত্র কোথাও যে সম্ভবপর হয় নি, তার প্রধান কারণ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে এই বৈষয়িক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সমন্বয়।

বাঙালীদের আধুনিকতার পথও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে সহজতর ঘনিষ্ঠতার ফলেই উন্মুক্ত হয়। জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্যেও আধুনিক। প্রাক-রেনেশাঁস ইউরোপে জাতীয়তাবোধ বিশেষ প্রচলিত হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আওতাতেই পাশ্চাত্যে জাতীয়তাবোদের ব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে[২]। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে জাতীয়তাবোধের প্রভাব সমাজমানসে অত্যন্ত প্রবল। তার ঢেউ এসে শিক্ষিত বাঙালীর মনেও লাগল। উনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত বাঙালী সমাজ-মানসে এর প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত। ইতিপূর্বে যে ভারতীয় হিসাবে জাতিয়তাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল তা বলাই বাহুল্য। অথচ ইংরেজেরা বাঙালী অথবা অন্যান্য ভারতীয়দের ভারতীয় হিসেবেই সনাক্ত এবং যখন তখন লাঞ্ছনা অবমাননা করে এসেছে। এদেশের গোষ্ঠিচৈতন্যের ভারতীয় জাতীয়তাবোধে রূপান্তরিত হওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক হলেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীদের মনে জাতীয়তাবোধের সীমা প্রাদেশিক চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। (রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন আসাধারণ মনীষীর মনোভাবকে আমরা বাদ দিচ্ছি)। প্রথমত, দাস-মনোভাব এবং যথার্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব যে-পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতায় নিঃসন্দেহ ছিল, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেই তুলনায় তার যথার্থ শ্রদ্ধা একেবারেই ছিলনা। পরে ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিয়ে যে নাচানাচি দেখতে পাই তার উৎস প্রধানত দাসজাতিসুলভ হীনমন্যতার (inferiority complex) মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এই হীন-মন্যতার প্রভাবেই আবার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় স্বল্পপরিচিত অন্যান্য প্রদেশীয়দের যথেষ্ট অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং ভারতীয় হিসেবে গন্য না হয়ে বাঙালী হিসেবে আত্মপরিচয়ে উৎসুক হয়ে ওঠে। তাছাড়া,

(২) *Cf.* Hans Kohn—Idea of Nationalism (New York 1951)

উত্তরভারতীয় উন্নাসিক ব্রাহ্মণকুল অনার্যসংস্কৃতি প্রভাবিত বাংলাকে চিরদিনই 'আর্যাবর্তে'র বাইরে স্থান দিয়েছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কাণ্ড থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন একথাও অনস্বীকার্য। এই সব কয়েকটি কারণে প্রথম দিকে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে ঠিক স্বীকার করে নিতে পারে নি এবং বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী বাবুদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেয়ে প্রাদেশিক চেতনাই প্রখর ছিল। পরে অবশ্য নানা কারণে বিশেষত বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীদের মনে সত্যিকারের ভারতীয় জাতিয়তাবোধের সূত্রপাত হয়। তবে জাতিয়তাবোধের ধাপে ধাপে যে পরিণতি, তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বাঙালীদের মধ্যেই সর্বাগ্রে লক্ষ্য করা যায়। আবার এজন্য বক্ষস্ফীত করারও কোন কারণ নেই, কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রই এজন্য মূলত দায়ী।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবোধের বিকল্প স্বরূপ যে-প্রাদেশিকতার সূত্রপাত হয়েছিল, তারই জের এখন পর্যন্ত আমরা টানছি। ইতিমধ্যে ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িকতা গান্ধীজির তিরোধানের প্রতিক্রিয়ায় স্তিমিত হয়ে আসার পর থেকেই যেন এদেশের সংকীর্ণ গোষ্ঠিমন্যতা প্রাদেশিকতার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

বর্তমানের যে-প্রাদেশিকতা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে তার প্রসার কিন্তু কেরাণীগিরির ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নেই দেখা দিয়েছে। ইংরেজদের শাসন পরিচালনা এবং ব্যবসার স্বার্থে যে-কেরাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রধানত বাঙালীদের দ্বারাই পুষ্ট হয়েছিল। এই কেরাণীকুল বাংলাদেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন প্রদেশে এবং যেখানেই তারা গেছে, প্রাদেশিক গোষ্ঠী-আনুগত্যে সর্বত্রই স্বজাতি

পোষণ করে সেইসব স্থানে কায়েমী হয়ে বসেছে। পরবর্তী কালে স্থানীয় লোকও যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেরাণী পদ-প্রার্থী হয়েছে তখন এই প্রবাসী বাঙালী গোষ্ঠী তাদের কাছে বাধা-স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে বাঙালীদের দম্ভ এবং অবজ্ঞাও স্থানীয় লোকেদের কাছে বাঙালী বিদ্বেষের কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আজ তাই বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী বিতাড়নের রব উঠেছে। এই পরিস্থিতি বিশেষত উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং আসামেই লক্ষ্য করা গেছে তার কারণ এইসব প্রদেশেই বাঙালী কেরাণীদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল সব চেয়ে বেশী। প্রাদেশিকতা শুধু যে বাঙালী এবং অবাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা ভাবলে ভুল হবে। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং কতকটা ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার ফলে, এদেশের শিক্ষা আমাদের প্রধানত কেরাণীগিরিরই উপযুক্ত করে তোলে; তাই ভারতের সর্বত্রই আজ কেরাণীপদের জন্য মারামারি। একই গোষ্ঠি-আনুগত্যে মাদ্রাজী অফিসার মাদ্রাজীদের উপর পক্ষপাতিত্ব করছেন, যেমন এককালে বাঙালীরা করেছেন।

প্রাদেশিকতার সমস্যা তাই প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের (অথবা আমরা যাকে বলি ভদ্রলোকের) সমস্যা। সমগ্র প্রদেশের (বা রাজ্যের) স্বার্থের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

মূল প্রশ্নই তাই আত্মসনাক্তির। একথা যদি আমরা মেনে নিই যে শুধু কেরাণী হওয়া ছাড়াও আমাদের অন্যতর বা মহত্তর লক্ষ্য আছে, তবে 'আমি আগে ভারতীয়' এই স্বীকৃতিই বাঙালী অথবা ভারতের অন্যান্য যেকোন প্রদেশীয়ের পক্ষে স্বার্থের অনুকূল। দেশের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কি ব্যবহারিক কি মানসিক প্রসার একান্ত প্রয়োজন। দেশের শিল্পায়নের সঙ্গে সংকীর্ণ গোষ্ঠিমন্যতার সাহচর্য অসম্ভব। পাশ্চাত্ত্যে এ সত্য পরীক্ষিত, এ দেশের ক্ষেত্রে অন্যথা হ'তে পারে না।

অলৌকিক

মানুষ দুইরকমের ঘটনার (phenomenon) সম্মুখীন হয়। এক ধরণের ঘটনা তার পরিচিত এবং বোধগম্য—বলা চলে লৌকিক; অন্য ধরণের ঘটনা তার অপরিচিত এবং বুদ্ধির অতীত—বলা চলে অলৌকিক। শুধু ঘটনা নয়, প্রাণী বা অপ্রাণী বিশ্বের সবকিছুই এইভাবে লৌকিক আর অলৌকিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লৌকিক ঘটনা বা বস্তুর সামনে মানুষ অস্বস্তিবোধ করেনা, কিন্তু অলৌকিক ঘটনা বা বস্তুর সম্মুখীন হলে মানুষ বিমূঢ় এবং অনেক ক্ষেত্রেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ভাব শুধু মানুষে না, প্রাণীমাত্রেই লক্ষ্য করা যায়, মানুষ শুধু প্রাণী-মানসের জের টেনে চলছে মাত্র। ঘোড়া চাবুককে ভয় পায় ঠিক, কিন্তু চাবুক দেখে সে ভয়ে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয় না—তা সম্ভব হঠাৎ তার সামনে একটা লাল বা হলদে ছাতা খুলে ধরলে। শোনা যায় এরকম হঠাৎ ছাতা খুলে ধরলে সিংহ পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যায়। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা মরা ইঁদুরকে কাঠির সঙ্গে সুতোয় ঝুলিয়ে বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাঘ ত ভয়ে একেবারে কেঁচো! যতক্ষণ না ইঁদুরটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে নাকি ভয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপেছে আর গুঙিয়েছে।[১]

এই অলৌকিকের ভীতিই মানুষের প্রথম পূজা বা দেবভজনার প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথমপূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ মানুষ তখনও বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে

(১) *Cf*, Edward Westermarck, "The Goodness of Gods" London, 1926, p. 1.

দেখতে পায়নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয় বিপদের দ্বারা বেষ্টিত।"[২]

আদিমানবের চতুর্দিকেই বিপদ। বন্য পশু, বিজাতীয় বা ভিন্নগোষ্ঠীর শত্রু, ঝড়, বন্যা, মহামারী—বিপদ আর দুর্যোগের ত শেষ নেই! পশু বা মানুষের আক্রমণ সে বুঝতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ কি? নিশ্চয়ই ঝড়, বন্যা, মহামারী, এরাও মানুষ আর পশুর মতই প্রাণী (অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন)। এদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? উপায়, খাদ্য বা নৈবেদ্য ইত্যাদি সম্ভার দিয়ে তাদের তুষ্ট করা। অনেক ক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় এইসব দেবতার (বা অপদেবতার) ভয়ের সঞ্চার করে তাদের তাড়িয়ে দেবার প্রথাও চলিত হয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রচলিত গণেশ, শীতলা, মনসা, চামুণ্ডা, মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, ইত্যাদি অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা এবং সংশ্লিষ্ট আচারগুলি যে এই ভাবেই সুরু হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের ঐতিহ্যও তাই অতি প্রাচীন, প্রাগার্য। আর্যদের দেবতারাও অনেকেই একই সূত্রে জন্মলাভ করেছেন। রুদ্র অতি প্রাচীন দেবতা, পরে তিনি মঙ্গলময় শিব বা মহাদেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদিরূপ কি? ঋগ্‌বেদের প্রার্থনায় তাঁর যে স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মোটেই মঙ্গলময় বা ভদ্র নয়ঃ

> "হে রুদ্র, সন্তান-জননীকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না···রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তাঁহার **মহতি দুর্মতিও** আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে রুদ্র, তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর।" (২। ৩৩)

আরও দেখি, "রুদ্র দীপ্তিমান অসুর" (৫। ৪২। ১১) তিনি উগ্র, 'ভীমমৃগ' অর্থাৎ ভীষণ আরণ্যকতুল্য ধ্বংসকারী (২। ৩৩। ৯,

---

(২) কালান্তর।

১১), রুদ্র শব্দই এসেছে রুদ্ ধাতু (রোদন) থেকে। "রোদয়তি (মনুষ্যান) ইতি ॥" যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেও রুদ্রের ভয়ঙ্কর মহিমা কীর্ত্তিত। এই সময় থেকেই ক্রমশঃ তিনি মহাদেবের রূপ নিচ্ছেন। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে শতরুদ্রীয় হোমের মন্ত্রে তাঁর বিভিন্ন পরিচয় পাই। তিনি কদর্পী, নীল-গ্রীব, নীল-লোহিত, প্রথম দৈব-ভিষক্, সহস্রাক্ষ, তাম্র-অরুণ-বভ্রুবর্ণ। তিনি বিশ্বরূপ, সহস্র রুদ্র। তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন ; **শান্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন**। 'মা হিংসী পুরুষং জগৎ'—পুরুষ (মনুষ্য), জগৎ (অশ্ব গবাদি পশু) হিংসা করিও না। অথর্ববেদের প্রার্থনাও ঋগ্‌বেদেরই অনুরূপ ঃ

> "হে রুদ্র আমাদিগকে হিংসা করিও না। পুরুষ, গো, ছাগ, মেষ আকাঙ্ক্ষা করিও না। হিংসক প্রজাদিগকে বধ কর। **জ্বর-কাশি-উপদ্রবকারী** রুদ্রকে নমস্কার করিতেছি। তুমি অরণ্য পশু গ্রহণ কর, গ্রাম্য পশু গ্রহন করিও না। জ্বরাদি রোগ দ্বারা, আয়ূধ দ্বারা, বিষ দ্বারা, বিদ্যুৎ দ্বারা, অগ্নি দ্বারা গ্রহণ করিও না। আমাদের বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, পিতা, মাতা ও শরীর হিংসা করিও না। রুদ্রের গণদিগকে নমস্কার করিতেছি। কিরাতবেশী দেবের বৃহৎ মুখবিবর বিশিষ্ট কুক্কুরকে নমস্কার করিতেছি।"[৩]

শুধু রুদ্রদেব না, তার চেলা-চামুণ্ডা ('গণদিগকে') মায় কুক্কুরটিকে পর্যন্ত তুষ্ট করার চেষ্টা! আমাদের দেব-আরাধনার সূত্রপাতে ভয় যে কতখানি ভূমিকা নিয়েছিল তার সাক্ষ্য বেদে অজস্র। মা দুর্গা বেদে ঠিক প্রকাশিতা হন নি। ঋগ্‌বেদে রুদ্রাণীর দেখা পাই না। তবে যজুর্বেদে অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনীরূপে আরাধনা করা হয়েছে ('শতপথব্রাহ্মণে' অবশ্য অম্বিকা রুদ্রের পত্নী)

---

(৩) *Cf.* যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল," পৃ. ৮৮

'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' অম্বিকাকে শরৎ ঋতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরই দ্বারা রুদ্র হিংসা করেন। সায়নাচার্য টীকা করেছেন—শরৎকালে "পীনস্ জ্বর উৎপাদন হেতু" রুদ্র হিংসক, অম্বিকা হিংসিকা। শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখেছেন, "অম্বিকা শরৎরূপ ধারণ করিয়া জ্বরাদি উৎপাদন করেন।" আমাদের মা-দুর্গার প্রাথমিক কল্পনাতেও (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) তিনি ভয়ঙ্করী, শত্রুদলনী, মহিষমর্দিনী। দুর্গা পূজার ঐতিহ্যর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো প্রাচীন আরো ভয়ঙ্করী প্রাগার্য দেবী চণ্ডীর পূজা। সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। দক্ষিণরায় ব্যাঘ্র-দেবতা। এই পূজার মূলে যে ব্যাঘ্রের উপদ্রব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেদিনীপুর এবং বাংলার অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বনদেবতার পূজা প্রচলিত। এই বনদেবতারা কোথাও বাঘ, হাতি, ভালুক, সাপ প্রভৃতি জন্তুরূপে কোথাও বা অন্যমূর্তিতে পূজিত, কিন্তু (সেক্ষেত্রেও এই সব জন্তুরাই তাঁদের বাহন)। "এখনও লোধাদের গ্রামদেবতা বড়াম (বা গড়াম) বাঘ বা হাতির পিঠে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান বলে তারা কল্পনা করে। বড়াম প্রীত না হলে বা ক্ষেপে গেলে গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্য বাড়ে, এও তাদের বিশ্বাস। তাই বড়ামকে তারা পূজার্চনা করে। মুর্গী পায়রা বলিদান দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তেমনি রুদ্রা ও চণ্ডীকেও করতে হয়।" (বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,' পৃ-৪৫৭), পূর্ব বাংলায় কুমীর পূজা এবং বাংলার সর্বত্র সর্পপূজার যে প্রচলন এখনও বিদ্যমান তার সঙ্গে প্রাচীন ফলনোৎসবের (fertility rites) বা টোটেম-প্রথার সম্বন্ধ থাকলেও ভীতিও যে এইসব পূজার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রত্যেক দেবতাই যে ত্রাস-জাত তা বলা মুস্কিল। ইন্দ্র প্রাচীনতম দেবতাদের একজন, রুদ্রের চেয়েও প্রাচীন (পশুপতি

রুদ্র খ্রীঃ-পূ ৪৫০০ অব্দের কল্পনা বলে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেন। কিন্তু তাঁর অনুমানে ঋগ্‌বেদ আট নয় হাজার বছরের। এই ঋগ্‌বেদের প্রাথমিক রচনাসমূহেও ইন্দ্র স্তুতি। ঋগ্‌বেদের প্রায় দশ হাজার সূক্তের মধ্যে আড়াই হাজার সূক্তই ইন্দ্র-স্তুতি। ভারতীয় এবং ইরাণীয় আর্যগণ যে একই শাখা-সম্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ইরানীয় শাস্ত্র অভেস্তা-তে ইন্দ্রের যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, রুদ্রের সেরকম কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না[৪]। ইন্দ্রের একনাম বেদে বৃত্রঘ্ন, বৃত্রাসুরের নিধনকারী। অভেস্তাতেও 'ভেরেত্রাঘ্ন' একজন প্রধান দেবতা। ইন্দ্রের স্বরূপ রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর নয়, বস্তুত ইন্দ্র মানবের কল্যাণকারী দেবতা, বৃষ্টির দেবতা। বৃষ্টিরোধকারী বৃত্রাসুরকে পরাভূত করে তিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন (ঋগ্‌বেদ ৫। ৩২। ১) সূর্য এবং বরুণের পূজাও একই কারণে।

বায়ু মেঘ বহন করে এনে বৃষ্টিপাতের সহায়তা করে, তাই বায়ু দেবতারূপে পূজিত। এইভাবেই অগ্নিদেবতার সৃষ্টি। সকলেই কল্যাণের দেবতা। আকাশ-গঙ্গাকে (ইংরাজীতে বলা হয় milky way) ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সরস্বতী বা দিব্য সরস্বতী। "পূর্ব আকাশে সরস্বতী উঠিতে দেখিলাম। দিন কয়েক কিম্বা এক-মাস পরে বর্ষাকাল পড়িল। তখন বলিব সরস্বতীই বর্ষাকাল আনিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে বর্ষাঋতুর আগমনকাল জানাইয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাত্রী, বৃষ্টিদাত্রী, অন্নদাত্রী। এইরূপ মূলভাব হইতে ঋগ্‌বেদের সরস্বতী কালক্রমে সুনৃতা ও বাগ্‌দেবী হইয়াছিলেন" (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' পৃ-১৭)। এই দেবী সরস্বতীই আবার কালে পুরাণের

---

(৪) অবশ্য অপাং নপাৎ-কে যদি রুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় তবে অন্য কথা। বেদ এবং অভেস্তা উভয় সাহিত্যেই অপাং নপাৎ-এর বিশেষ উল্লেখ আছে।

তিন প্রধান দেবীতে ভিন্ন হয়ে গেছেন : "ইড়া,[৫] ভারতী, সরস্বতী, সুরগঙ্গায় তিন স্থান ধরিয়া দিব্য সরস্বতীরই তিন অংশ বলা যাইতে পারে। ইড়া বর্ষা ঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী। ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে আমাদের পূজনীয়া সরস্বতী আসিয়াছেন" (ঐ—পৃ-২১)। আর্যদের দেবদেবীরা সকলেই প্রাকৃতিক, এবং বৈষয়িক ফল আকাঙ্ক্ষায় প্রাকৃতিক সাহায্যের আশাতেই এঁদের পূজার উদ্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে বিস্ময়ও অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক-পূজার মূল। আকাশ প্রথম থেকেই মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। আকাশ অবশ্য কল্যাণকারী রূপেও কল্পিত হয়েছে—আকাশই বৃষ্টিদাতা; সূর্য, বায়ু, ইত্যাদি যত শক্তি মানুষের কল্যাণ করে তারা আকাশ-চারী। কিন্তু নিঃসন্দেহে আকাশের বিশালতায় এবং বৈচিত্র্যে মানুষের বিস্ময় থেকেই বেদ এবং আভেস্তার 'দ্যৌ'-এর আরাধনা। ('দ্যৌ' থেকেই গ্রীক্ দেবতা Zeus শব্দান্তরিত হয়েছেন) খ্রী-পূ ৫ম শতকের পারস্য সম্বন্ধে Herodotus যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখি তৎকালীন এবং প্রাচীন পারস্যে প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন 'দ্যৌ' অথবা আকাশ। হেরোডোটাস্ 'দ্যৌ'-কে নিজেদের দেবতা Zeus নামেই বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন মিশরে 'দেবতা' বোঝাতো 'নত্র্' (ntr) শব্দে। 'নত্র্', শব্দের শেষোক্ত র্-টি পরে লোপ পায় (XVIIIth dynasty) এবং 'ন্যতে' (Notye) শব্দে রূপান্তর ঘটে। এই 'নত্র্' শব্দের

---

(৫) 'ল' আর 'ড়' মিশ্রিত যে আদি সংস্কৃত অক্ষরটি প্রচলিত ছিল, তা বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষায় এই অক্ষরটি এখনও প্রচলিত। মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় 'বালক' শব্দ অনেকটা 'বাড়ক' উচ্চারিত হয়। 'ইড়া' শব্দটিরও বাংলায় তাই 'ইলা' উচ্চারণ করা হয়।

সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ 'নেত্র' (চক্ষু) শব্দের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। আকাশ সর্বব্যাপী, তাই সর্বদ্রষ্টা (বেদে যেমন ইন্দ্র সহস্রাক্ষ)। দেবতারাও সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। এইভাবে বিচার করলে মিশরে দেবতা-অর্থক শব্দের 'নেত্র' উচ্চারণে সঙ্গতি পাওয়া যায়, কারণ আকাশ থেকেই সভ্যতর জগতের অধিকাংশ দেবতার উদ্ভব। (যেমন 'দিব্' শব্দ থেকে 'দেব' শব্দের উদ্ভব। দিব্ অর্থ উজ্জ্বল; আকাশের সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাই যে বিভিন্ন দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি)। আর্যদের কাছে আকাশই আদি এবং প্রধান আরাধ্য শক্তি। Wiedemann অবশ্য মিশরীয় 'নত্র্' শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন[৬] যাই হোক, বিস্ময়ই আকাশ পূজার প্রধান প্রেরণা। বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী Edward Westermarck বলেছেন:

> "That the objects of religious worship as well as the forces applied to magic, are fundamentally more or less mysterious, awe-inspiring, supernatural seems to me to be well established fact inspite of Durkheim's assertion that the idea of the mysterious has a place in small number of advanced religions only. This is testified by language" ('The Goodness of Gods', p. 2)

---

(৬) "The word 'ntr' may be applied in two senses, viz, (1) to 'strike', 'knock down', 'throw' and their derivatives...... which while it is written, not with the symbol for 'God,' but with another syllabic sign, would nevertheless accord with the figure of axe; and (2) to 'grow', 'thrive', or 'be young'...... —not however in the special sense of 'to come periodically and to be renewed' as Loret supposed (A. Weidemann, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, 'God' Egyptian).

তারপর উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষায় দেবতা শব্দের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এইসব শব্দের অর্থই হল বিস্ময় বা রহস্য-সূচক। ডাকোটাদের (উত্তর আমেরিকা) 'wakan' শব্দ, হিদাৎসাদের 'mahopa', ফিজিদ্বীপে 'kalou', নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের 'atua',—এই সমস্ত শব্দেরই তাৎপর্য হল পবিত্র, ভৌতিক, বিস্ময়কর, ইত্যাদি অর্থ। মাওরিদের 'আটুয়া' শব্দে শুধু দেবতাই নয়, বুদ্ধির অতীত সবকিছুই বোঝায়, যেমন নারীর ঋতুস্রাব, কিম্বা বিদেশীয়দের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। মাদাগাস্কারে 'ন্দ্রিয়মানিত্রা' (ndriamanitra) শব্দে শুধু দেবতাই বোঝায় না প্রয়োজনীয় অথচ নূতন এবং বুদ্ধির অতীত সবকিছুকেই বোঝায়। বই-ও (তাদের ভাষায় 'তারাতাসি') দেবতা, কারণ বই-এর অদ্ভুত ক্ষমতা—তাকালেই সে কথা বলে দেয়।

যা কিছু অদ্ভুত, বুদ্ধির অগম্য বা অস্বাভাবিক, সবই আদিম মানুষের পূজা পেয়েছে—বিরাট পাহাড়, বিপজ্জনক নদীর বাঁক, অদ্ভুত বা বিরাট গাছ, অস্বাভাবিক আকারের পশুপাখী, এমনকি বিকলাঙ্গ বা বিবর্ণ (যেমন শ্বেতিরোগগ্রস্ত মানুষ) আদিমানব সমাজে ভয় এবং পূজার পাত্র ছিল ; তার প্রমাণ বর্ত্তমান আদিবাসীদের মধ্যে অনায়াসলভ্য। ঔষধিক গুণসম্পন্ন গাছগাছড়াকে পূজা করার রীতি আমরা আজও পৃথিবীর সর্বত্র দেখতে পাই। কোন নূতন জীবজন্তুর প্রথম দর্শনের সমকালে কোন দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা ঘটলে আগে সেই জন্তুকেই ঐ দুর্যোগের বাহন অথবা অপদেবতা বলে মনে করা হত। সাইবেরিয়াতে যেবার প্রথম উটের আগমন হয় সেবার নাকি খুব বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল, তাই কিছু আগেও উটকে ওখানে বসন্তের অপদেবতা বলে জ্ঞান করা হত। বিভিন্ন দেশে এখনও কালো বেড়াল, পেঁচা, প্রভৃতি পশুপাখীকে অপদেবতা জ্ঞান করা হয়।

আবার উপকারিতার জন্য গরু প্রভৃতি বিভিন্ন পশুকে পূজা

করা হয়। টোটেম-প্রতীক হিসেবেও অনেক পশুপাখী বা বৃক্ষলতাকে পূজা করা হয়[৭]। বাংলাদেশে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, কচ্ছপ, ভালুক, সাপ, প্রভৃতি জন্তু এবং বিভিন্ন বৃক্ষ যে 'টোটেম'-রূপে যে পূজিত হত তাতে সন্দেহ নেই। 'বাঘ' 'হাতি' ইত্যাদি জাতিগত উপাধির মধ্যে আজও সেই 'টোটেম-পূজার' স্মৃতি বেঁচে আছে। গোপভূমের রাজবংশের একজন প্রবীন বংশধর শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে ভালুক মরলে তাঁদের অশৌচ পালন করতে হত ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য)। এ প্রথা যে প্রাচীন বাংলার টোটেমিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

বংশবৃদ্ধির কামনাতেও বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। মনসা পূজার সঙ্গে একদিকে যেমন সর্প-ভীতি মিশে আছে আবার প্রজননশক্তির প্রতীক হিসেবেও সর্পপূজার সূত্রপাত ঘটেছে। বস্তুত এক একটি পূজার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস মিশে আছে। ষষ্ঠী পূজাও

---

(৭) 'টোটেম' এক ধরণের আদিম সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজে কোন জন্তু, বৃক্ষ, লতা বা অন্য কোন প্রাণীকে সেই গোষ্ঠীর আদি জনক বলে মনে করা হ'ত। সেই প্রাণীকে (বা বৃক্ষ, ইত্যাদি) সেই গোষ্ঠীর সকলেই পরমপবিত্র জ্ঞানে পূজা করত। এইসব প্রাণী সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠিভুক্ত মানুষের কাছে অবধ্য এবং সেই গোষ্ঠী এই প্রাণীর নামে চিহ্নিত হ'ত। পৃথিবীর সর্বত্র আদিবাসীর মধ্যে টোটেমিক সমাজ-ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। আমদের দেশে 'গোত্র' সম্ভবত টোটেমিক ঐতিহ্য বহন করছে। নাগা প্রভৃতি জাতি টোটেমিক ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পরিচয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন "টোটেম-পূজার" উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। টোটেম সমাজ-ধারার সূত্রপাত সম্বন্ধে প্রচুর মত ভেদ আছে। এই সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানে এত গভীর এবং প্রচুর আলোচনা হয়েছে যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। টোটেম শব্দটি পলিনেশীয় শব্দ, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই শব্দটির কোন পরিভাষা ব্যবহার না করে এই শব্দটিকেই সমাজ-বিজ্ঞানে প্রচলিত করেছেন। আমরাও তাই বাংলায় টোটেমের প্রতিশব্দ আপাতত প্রয়োজনীয় মনে করি না।

প্রজননশক্তির আরাধনা। আমাদের দেশে শিবপূজার সঙ্গে লিঙ্গোপাসনার ঐতিহ্য মিশে আছে। শিব প্রথমে অনার্যদের উপাস্য দেবতা থেকে আর্যসমাজে পরে গৃহীত হয়েছেন। ঋগ্‌বেদে শিশ্নদেব নামে লিঙ্গোপাসক এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তারা ইন্দ্র-বিরোধী বলে বর্ণিত, কাজেই তারা যে অনার্য ছিলেন তা বোঝা যায়।

দেব কল্পনার মূলে ভয়, বিস্ময় বা অন্য যে-কোন ভাবই প্রধান হোক, বিভিন্ন দেবতার চরিত্রের মধ্যে, এমনকি একই দেবতার রূপান্তরের মধ্যে এক একটি সমাজের এবং তার বৈষয়িক পরিস্থিতির ছাপ সুস্পষ্ট। আদিম সমাজে যখন মানুষ 'বিশ্বনিয়মকে' বুঝতে শেখেনি, সেই অবস্থায় দেবতারা সকলেই ক্রুর ও ভয়ঙ্কর। তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় তাদের ঘুষ দেওয়া (অর্থাৎ পূজা) অথবা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় ভয় দেখিয়ে তাড়ান। বর্বর সমাজের দেবতারা প্রায় কেউই 'ভাল-মানুষ' নয়। মাওরীদের দেবতারা সকলেই দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদি সমস্ত অনর্থের মূলে। ভাল কেউই করে না, তবে মন্ত্রতন্ত্র-ঝাড়ফুঁকে (অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায়) তাদের অকেজো করে দেওয়া যায়, কিম্বা বলি দান করে বা নৈবেদ্য দিয়ে তাদের ক্রোধ ঠেকান যায়। তাহিতি দ্বীপের দেবতারাও কেউই মঙ্গলময় নয়। ফিজি দ্বীপের দেবতারা কারোর ইষ্ট করে না তবে অন্যের অনিষ্ট করার ফলে পরোক্ষে দ্বীপ-বাসীদের লাভ হয়ে যায়, যেমন বিদেশীদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে বা ঝড়ের ধাক্কায় চড়ায় এনে ভেঙ্গে ফেললে নানা খাদ্য বা জিনিষ-পত্র দ্বীপবাসীদের জুটে যায়। এদের দেবতাদের যে সব বিশেষণে ভূষিত করা হয় তাতেই দেবতাদের স্বরূপ বোঝা যাবে,—কেউ 'লম্পট', কেউ 'দাঙ্গাবাজ', কেউ 'খুনে', আরো কত কি! (cf. E. Westermarck 'Goodness of Gods,' p. 7.)। আমাদের

দেশের অধিবাসীদের দেবতাদের কথা মনে করুন। প্রায় সকলেই ভয়ঙ্কর এবং অনিষ্টকারী। ভেরিয়ার এলুইন সাওরাদের (বা শবর) দেবদেবীর একটা তালিকা করেছেন, সংখ্যায় তাঁরা ১৮০ জন। তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন রোগ, মহামারী, ক্ষতি বা সর্বনাশের কারণ ('Religion of an Indian Tribe', Bombay 1955) কৃষির সূত্রপাত সম্বন্ধে সাওরাদের মধ্যে বিভিন্ন উপকথা প্রচলিত আছে নিম্নোক্ত একটিতে তাদের দেবচরিত্র যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমে কোন ক্ষেত ছিল না। সব বনে জঙ্গলে ঢাকা। ক্রমে এই সব জঙ্গল সাফ করে মানুষ চাষ বাস সুরু করল। সাতরকমের বীজ বুনে তারা অঢেল শস্য ফলাল। আগাছা নেই, পোকামাকড় নেই, কাজেই কোন ভাবনা নেই,—বীজ বুনলেই নির্বিবাদে ফসলে মাঠ ভরে যায়। এত ফসল দেখে ত দেবতাদের চক্ষু চড়কগাছ ! কি সর্বনাশ, মানুষের যদি কোন অভাব না থাকে ত তারা দেবতার পূজা করবে কেন ? দেবতারা সব শস্যদেবতা কিট্টুং-এর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। কিট্টুং রাম্মা আর বিম্মাকে (রাম আর ভীম ?) পরামর্শ দিল ঘাস আর আগাছা জন্মাবার জন্য। কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যাবে ? কিট্টুং পরামর্শ দিল, যাও সাতমাসের গর্ভপাত ভ্রূণ যোগাড় করে মধ্যরাত্রে উলঙ্গ হ'য়ে ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পুঁতে দেবে। এইভাবে আগাছা জন্মাবে। আগাছা জন্মালে তা' সাফ করতেই মানুষের চাষের অর্ধেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে, পুরো ফসল ফলবে না। এইভাবে আগাছার সৃষ্টি হ'ল। তারও উপর আবার আরেক দেবতা জন্মোলসুম পোকামাকড়ের সৃষ্টি করে মানুষের শস্য-সম্পদ আরও কমিয়ে দিল। ফলে অভাবও আর শেষ হয় না ; আর অভাব এবং তজ্জনিত দুঃখকষ্টের লাঘব করার জন্য দেবতার পূজারও কোন ব্যঘাত ঘটছে না।

কয়েকজন দেবতা অবশ্য পূজা নৈবেদ্য পেলে মানুষের ভালো করে। তবে নিখুঁত সদাশয় দেবতা কেউই নয়। এমন কি সত্য আর ন্যায়ের দেবতা যে উয়ুংসুম, তিনিও শিশুদের জ্বরাক্রান্ত করেন, বৃদ্ধদের কুষ্ঠরোগ এনে দেন। ধর্মের দেবতা ধরম্মসুমকে কুষ্ঠ আর সন্ন্যাস রোগের জনক বলে মনে করা হয়। শস্য দেবতা কিট্টুং যেমন মানুষের উপকার করেন, তেমনি অপকারও কম করেন না[৮]।

(৮) Cf. Verrier Elwin, "Religion of an Indian Tribe", p.-93.

কোক্সোয়াগ্‌ম্যুট এস্কিমোদের বিশ্বাস প্রেতজগৎ (বা দেবলোক) তুঙ্গ আক (Tung Ak) নামক মহাপ্রেতের অধীন। ইনি সাক্ষাৎ মৃত্যু ; এঁর কাজ হল শুধু যন্ত্রনা দেওয়া। আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতীয়রা অলৌকিক শক্তির মঙ্গলকর অবদান স্বীকার করলেও সমস্ত অমঙ্গলের মূলেই অলৌকিক শক্তিকে দায়ী করে। বেচুয়ানাদের মধ্যে পঁচিশ বছর বাস করে মিশনারী শ্রীযুক্ত মোফাট কোনদিন শুনতে পান নি যে তাদের প্রধান দেবতা মেরিনো কারোর ভাল করেছে। নানা তথ্য খতিয়ে দেখে Westermarck তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বর্বর সমাজের দেবতারা মানুষের স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, মানুষের নৈতিক আচার আচরণেও তাঁদের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা ব্যস্ত নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ঃ

> "It seems that most gods of the uncivilized peoples are thoroughly selfish beings who care about nothing else than what concerns their own personal interest—that they are utterly indifferent to men's behaviour towards their fellowmen, neither disapproving of vice or punishing their wicked, nor approving of virtue or rewarding the good.........we are directly told by competent observers that the supernatural beings of savage belief frequently show the utmost disregard to all questions of worldly morality"[৯]।

বর্বরদের অপরিণত সমাজে দেবতার চিত্র অন্যথা হতে পারে না। প্রাক্‌-কৃষি মানবসমাজে জীবিকার সংস্থানে মানুষ খুব বেশী প্রকৃতি-নির্ভর ছিল না। শিকারজীবী মানুষ শিকারের অভাব ঘটলে

---

(৯) Edward Westermarck, 'The Goodness of Gods' P.-10.

বনান্তরে বা স্থানান্তরে যেত। পশু-পালক সমাজেও মানুষ অত প্রকৃতি-নির্ভর ছিল না। সেজন্য ঐ সব সমাজে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যও মানুষের চোখে পড়ে নি, প্রকৃতির শত্রুতাই তার চোখে পড়েছে বেশী। কাজেই তার দেবতার এই রূপ।

কৃষি-প্রধান সমাজে পরিস্থিতি অন্যরূপ। কৃষক কখনো যাযাবর থাকতে পারে না। তাকে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয় এবং সেইস্থানের ভৌগোলিক তথা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর তাকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এই নির্ভরশীলতার ফলেই ক্রমশঃ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যও চোখে পড়তে আরম্ভ করে, দেবতা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

বেদের দেবতারা এই সামাজিক রূপান্তরের সাক্ষ্য। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার প্রাক্কালে প্রধানত পশুপালকগোষ্ঠী ছিল বলেই মনে হয়। ঋগ্‌বেদে শুধু গরু নয়, মেষাদি অন্যান্য পালিত পশু সম্পর্কেও উৎকণ্ঠা নানাস্থানে লক্ষণীয়। ঋগ্‌বেদে অশ্বের উল্লেখ প্রচুর, কিন্তু প্রাচীন 'আর্যাবর্ত' অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ অশ্বের দেশ নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অনুমানে আর্যগণ তাঁদের আদি বাসস্থান কাস্পিয়ান হ্রদ অঞ্চল থেকে প্রচুর অশ্ব এদেশে আনেন ঃ "এশিয়ার মধ্যভাগে কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিকে অশ্বের আদি নিবাস। পুরাণে সে দেশের নাম কুশদ্বীপ। লোকে এই দেশেই বন্য অশ্ব মৃগয়া করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিত। আর্যগণও করিতেন, নচেৎ অশ্বমেধ আসিত না।" ('বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' পৃঃ-১২৪)! আর্যরা যে শুধু অশ্ব মৃগয়াই করত না, এবং জীবিকার অঙ্গ হিসাবে যে অশ্ব পালন করতেও সুরু করেছিল একথা ধরেই নেওয়া যায়। পশুপালন জীবিকায় মানুষকে যতটা আকাশের সান্নিধ্যে আসতে হয়, অন্য কোন জীবিকায় তত নয়। তাই কি ঋগ্‌-রচনার প্রাক্কালে 'দ্যৌ'-এর এত প্রাধান্য ? 'দ্যৌ' যে ভারতে আসার আগে দেবতাদের প্রধান

ছিলেন তা পারস্যের দেবতাদের প্রসঙ্গেই স্পষ্ট হয়েছে[১০]। অথচ ভারতে এসে কৃষি-জীবী সভ্যতায় সুস্থির হবার পর বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র প্রাধান্য পেলো। পারস্যে সমাজপ্রগতির সঙ্গে সূর্য বা 'মিত্র' (বর্তমান উচ্চারণ 'মিথ্') প্রধান দেবতা হয়ে উঠলেন। এদেশও প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সম্বন্ধে বোধ যত স্পষ্ট হতে থাকল ততই ক্রমশঃ সূর্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। ক্রমশঃ সূর্য-পরিক্রমা এবং তার সঙ্গে ঋতুর সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর কল্পনা এবং প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। "যেমন অন্যান্য সূর্যের শক্তি, বিষ্ণুও তেমন সূর্যের বার্ষিক গতিশক্তি।" অবশ্য অন্যান্য সমস্ত কৃষিসভ্যতার মত বৈদিক সমাজেও সূর্যই সর্বপ্রধান দেবতা রইলেন (ঋগ্‌বেদ ১।১৬৪)। কৃষি-নির্ভর মিশরেও সূর্যদেব 'রা'-ই চিরদিন প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন[১১]।

বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে ত্রাস-জাত দেবতারা লুপ্ত হয়ে গেলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। তারা পাশাপাশি

---

(১০) "The premier position amongst early Persian devinities assigned by Herodotus to the sky is in perfect consonance with the supremacy which the Sky-god enjoyed amongst the Indians under the name of Dyaus or later under that of Varuna" (E. Edward, in Encyclopædia of Religion and Ethics, 'God' (Iranian)".

(১১) "......In an early prehistoric day, the various communities of Egypt, not yet consolidated under a single government had each its special deity. This local deity, presiding jealously over the interests of its own people, came naturally to greater or less importance in proportion to the growth or decay of the community over which it presided...

Thus it is clear that in the time of the New Kingdom when Thebes became the capital and chief centre of the empire, Amen the local god of Thebes came to assume an importance hitherto denied to him. At last it was even customary to identify Amen with *Ra, the greatest god of all, or the king of the gods*, and the compound name Amen—Ra came into use." (The Historians' History of the World, Ed. by Henry Smith Williams. Vol. 1, Part II, Chap X, p. 220 London, 1907.)

পূজিত হয়েছেন। বিশেষত অলৌকিকের ভীতি আজও পর্যন্ত বর্তমান। তাই আমরা পাশাপাশি ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি কল্যাণের দেবতাদের সঙ্গে রুদ্র, অম্বিকা, গণেশ, প্রভৃতির ত্রাসজাত দেব-দেবীর পূজা দেখতে পাই। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের আবার রূপান্তর ঘটেছে। সব দেবতারই সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপান্তর ঘটেছে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ক্রমশঃ দেবরাজ এবং জয়ের দেবতা হয়ে উঠলেন, কেননা ভারতে এসে আর্যগণকে সর্বদা অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই অবস্থায় কোন পরাক্রান্ত দেবতার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। সেকালের দেব-কূলে ইন্দ্রকেই সবচেয়ে পরাক্রান্ত বলে মনে করা হত। প্রথমত যিনি বজ্র (অর্থাৎ বাজ) পরিচালনা করেন তিনি নিশ্চয়ই অতীব শক্তিশালী। তাছাড়া অনাবৃষ্টির মত এত ক্ষতিকর শত্রু যিনি নাশ করতে পারেন তাঁর ক্ষমতায় কোন সন্দেহ থাকে না। ঋগ্‌বেদের বহুস্থানে পণিদের নাম আছে। এক ঋষি বলছেন, "অগ্নিযজ্ঞরহিত, মিথ্যাভাষী, হিংসিতবাক্‌, শ্রদ্ধারহিত, বুদ্ধিশূন্য পণিনামক দস্যুদিগকে বিদূরিত করুন।" (৭।৬।৩) পণিরা আর্যদের গোধন চুরী করে কোন দূরবর্তী নদীর পারে পর্বত-গুহায় লুকিয়ে রাখত। ইন্দ্র সেই পণিগণকে পরাস্ত করেছিলেন। ঋগ্‌বেদের একস্থানে বৃত্রকে 'দাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র সেই দাসকে বিনাশ করেছিলেন। বৈদিক এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে ইন্দ্রের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ আর্য আর অনার্যদের সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর শত্রুতায় ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ দেবতারও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়; বেদ পুরাণের কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ[১২]। কতকগুলি কারণে মনে হয় মূলতঃ

(১২) "Natural human sympathies and antipathies are likewise transposed into the religious sphere, the foes and friends of the group becoming the foes and friends of the gods" (Alfred Bertholet in Encyclopaedia of Social Sciences—Religion.)

একজাতীয় হয়েও আর্যদের যে গোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের সঙ্গে ইরাণীয় আর্যগোষ্ঠীর সংঘাত লেগেছিল। তাই পারস্যে 'অসুর' উপাস্য আর 'দেব' শব্দ দানব অর্থে ব্যবহৃত[১৩]। অসুর-ই পরে 'আহুর' এই ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, জোরো স্ত্রিয়দের সবচেয়ে বড় দেবতা 'আহুরমাজদা'। ভারতে ঠিক বিপরীত।

সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের স্বরূপ আরও মার্জিত হয়ে আসে। Alfred Bertholet-এর ভাষায়:

> "The progress of culture in general is accompanied by a gradual refinement and spiritualisation of religious and ethical concepts as well as of ceremony. The demonistic spirits whose actions are as a rule unpredictable are either gradually replaced by friendly deities or the evil spirits are reduced to a position of melicious, but in the last analysis impotent antagonists" (Ency. of Social Sciences—Religion).

আমাদের দেশে অনার্য অপদেবী চণ্ডী ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে যে ভাবে ক্রমশঃ সর্বমঙ্গলা শিবাণী, জগন্মাতা ভবানী এবং হিমালয় দুহিতা উমায় রূপান্তরিতা হয়েছেন তা' Bertholet-এর উক্তি প্রমাণ করে[১৪]। ব্রহ্মার কল্পনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান তা' সভ্যতার অনেক পরবর্তী স্তরেই সম্ভব, তাই হাজার হাজার বছর ধরে রচিত হওয়া সত্ত্বেও ঋগ্‌বেদে ব্রহ্মার কোন উল্লেখ নেই।

একটা সংস্কৃতি যখন অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে তখন উভয়

---

(১৩) অভেস্তায় উক্তি আছে: শস্য (গম) পেষার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা (অর্থাৎ দানবেরা) যন্ত্রণায় গোঙায়"। "when corn is ground the daevas (devils) groan"—Alfred Bertholet in Ency. of Social Science—Religion.

(১৪) "শক্তিপূজার রূপান্তর" দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটে। আমাদের দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর রূপান্তরের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় বা মিশ্রণ (acculturisation) স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদেবীর উল্লেখ আগেই করেছি। চণ্ডীদেবী নিঃসন্দেহে অনার্যদেবী। সেই চণ্ডীদেবীই (অথবা 'চাণ্ডী') পরে দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে আর্যসমাজে গৃহীতা হয়েছেন। এই রূপান্তর সহজে ঘটেনি। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর তিনি উচ্চতর সমাজে গৃহীতা হয়েছেন ; তার ইঙ্গিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট[১৫]। তেমনি রক্তকলুষ বিঘ্নকৃৎ গণপতি হয়ে দাঁড়ালেন বিঘ্ননাশন সিদ্ধিদাতা গণেশ (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—'লোকায়ত দর্শন', ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। রুদ্র কি সত্যিই আর্যদের দেবতা ছিলেন ? না ভারতে আসার পর অনার্য সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছেন ? ঋগ্‌বেদের একস্থানে রুদ্রকে 'অসুর' বলা হয়েছে (৫।৪২।১১)। ভারতে আসার আগে আর্যরা রুদ্রোপাসনা করতেন না বলেই মনে হয়। 'অভেস্তা'-য় রুদ্রের কোন উল্লেখ নেই। বিদ্যানিধি মহাশয়ও রুদ্রের কল্পনা খ্রীঃ-পূঃ ৪৫০০ হাজার বছর আগের বলে মনে করেন, অথচ ঋগ্‌বেদকে তিনি ৮।৯ হাজার বছরের প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অথর্ব বেদেও রুদ্রকে 'কিরাতবেশী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'কিরাত'-রা যে অনার্য জাতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তারা 'ইন্দো-মঙ্গোলীয়' (Indo-Mongloid) শাখাসম্ভূত। এক্ষেত্রে তাকে 'কিরাতবেশী' বলে আর্যসমাজভুক্ত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে করা যায় নাকি ?

সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একদিকে যেমন নতুন নতুন আবিষ্কারে তার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে

(১৫) Cf. বিনয় ঘোষ, "বাঙালীর দুর্গোৎসব" 'শারদীয় 'মুখপত্র', ১৩৫৯

আবিষ্কারই আবার নতুন প্রয়োজনের, নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে মানুষের কর্মের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রভাবের সীমা বিস্তৃত হয়েছে বা নতুন দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সূর্য এবং বিষ্ণুর প্রভাবের বিস্তৃতি লক্ষণীয়। আগুনের ব্যবহার আবিষ্কারের পর থেকেই অগ্নিদেবতার উদ্ভব; তেমনি সভ্যতার পরবর্তী ধাপে ধাপে বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি হয়েছে[১৬]।

মানুষের সমাজ-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে দেবলোকের সমাজ। মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ দেবলোকেও প্রতিফলিত। মা-দুর্গার সন্তানসন্ততিসহ যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা বাংলার ঘরোয়া সামাজিক চিত্র। দেবতাদের পত্নী-পুত্র ইত্যাদি মানুষের সমাজেরই প্রতিফলন। আবার দেখি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবতাদের প্রাধান্য, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবীদের। ঋগ্‌বেদের প্রাথমিক যুগে বাক্ দেবীর কিছুটা প্রতিপত্তির পর দেবীদের স্থান পরে নিতান্ত নগণ্য হয়ে এসেছে, তার কারণ আর্যরা ক্রমশঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্থিতিলাভ করছিল। পরবর্তী যুগের দুর্গা, চণ্ডী, মনসা ইত্যাদি দেবীরা প্রধানত অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল। দ্রাবিড় সমাজ প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ছিল, তাই এই সব সমাজে দেবতার চেয়ে দেবীর প্রাধান্য বেশী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'ধনপতি' আর্যসমাজের প্রতিনিধি। তিনি তার স্ত্রী 'খুল্লনা'কে চণ্ডীপূজা করতে দেখে অতীব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তখন আর্যকুলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজধারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সমাজে

---

(১৬) "Every step in cultural progress extends the sphere of existing gods or creates new ones. For it widens the range of human needs and human needs in turn call into being gods who can satisfy them"—Alfred Bertholet, in Encyclopaedia of Social Sciences, 'Religion'.

নারীর কোন সামাজিক স্বীকৃতিই নেই, এমন কি স্ত্রী-দেবতার পূজা করতে তারা নারাজ ঃ

“এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট ঝারি
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥”

উপরোক্ত চিত্র অবশ্য আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক সংঘাতেরও প্রতিচ্ছবি বলে গণ্য হ'তে পারে।

এবার দেবতা-কল্পনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি খতিয়ে দেখলে দেব-রহস্য আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রতীয়মান হবে (অন্তত সমাজ-তাত্বিক দৃষ্টিকোণে)। প্রথম পর্যায়ে বিশ্বনিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রসূত ভয় থেকে সূত্রপাত হয় কাল্পনিক অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে ধারণা। এই অলৌকিক শক্তিগুলি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলে মনে করা হত, কেননা তারা ঝড়, বৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক (আদিমানুষের চোখে অলৌকিক) ঘটনা সংঘটিত করে। যার ইচ্ছাশক্তি আছে, তার নিশ্চয়ই কামনা-বাসনা-অনুরাগ-বিরাগ-লোভ-ভয়-ঈর্ষা-দ্বেষ সম্বলিত মনও আছে এবং মন আছে অথচ দেহ নেই একল্পনা আমাদের আদিপুরুষদের সাধ্যাতীত ছিল, কাজেই ধীরে ধীরে দেবতার মূর্তি কল্পিত হল। এই মূর্তি-কল্পনার পিছনে অবশ্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াপদ্ধতির অবদান আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

মূর্তি কল্পনাই দেবতার বিকাশের শেষ পর্যায় নয়। শুধু মানুষের মত হলে দেবতাদের চলবে কেন? মানুষের চেয়ে উন্নত হওয়া চাই। তাই একদিকে যেমন আমাদের দেশে মূর্তিরও নানা বিকাশ ঘটেছে তেমনি অন্যান্য দেশে আবার অধিকাংশ

ক্ষেত্রে মূর্তিকল্পনাই পরিত্যক্ত হয়েছে। দেবতার ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে সমস্ত বাস্তবতাই বর্জন করতে হয়, তাই দেবতার দেহ-কল্পনাও বর্জন করা হল[১৭]। শুধু ইসলাম এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মে নয়, আমাদের দর্শনেও চিন্ময়, অক্ষয়, অব্যয় ঈশ্বরের কল্পনা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

জগদীশ্বর, বা পরমেশ্বরের কল্পনা সভ্যতার অনেক পরবর্তী স্তরের, যদিও এ বিষয়ে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীরা একমত নন। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের 'আদিপুরুষ' (Dawn-Beings) বা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের 'মহাপ্রেতের' (Great Spirit) কল্পনা থেকেই ঈশ্বর কল্পনার এবং একেশ্বরবাদের সূত্রপাত বলে Andrew Lang প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন[১৮]। অনেকে আবার এই আদিপুরুষ বা 'পরমপিতা'র ধারণা খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শের ফলে আদিবাসিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন, যেমন আমাদের দেশে সাওরাদের মধ্যে 'মাপ্রুন' (মহাপ্রভুর অপভ্রংশ) বা পরমেশ্বর কল্পনা হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফল (cf. Sitapati, The Saoras, J. A. H. R. S., Vol XIII, p. 133—cited by V. Elwin in 'The Religion of an Indian Tribe,' p. 84)। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেবলোকের অধিপতিকল্পনার সহায়তা করেছে এবং ক্রমশঃ সব

(১৭) "But the anthropomorphic god is not the last creation of his (man's) imagination. The tendency to make gods more and more perfect......gradually led to the notion that materiality is a quality which is not becoming to a god. Hence men endeavoured, to the best of their ability, to grasp the idea of a purely spiritual being, endowed with a mind, but without a material body." (E. Westermarck, 'The Goodness of Gods', p. 6)

(১৮) Cf. (1) A. Lang in Encyclopaedia of Religion and Ethics—God (Primitive and Savage) (2) A. R. Radcliffe Brown—"Religion and Society" (Henry Myers Lectures, 1945.)

দেবতার উর্দ্ধে ঈশ্বর-কল্পনা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত, হয় একথা ধরে নেওয়া চলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মগুলি বোধগম্য হওয়াতে দেবতাদের যে ছাটাই সুরু হয়েছিল তার ফলে ক্রমশ আজ অনেক দেশেই স্বরূপ দেবতারা বিলুপ্ত, কিন্তু দেবলোকের অধিপতি পরমেশ্বরের কল্পনার অরূপতা বা চিন্ময়তাই তাঁকে এই বৈজ্ঞানিক জগতে আজ পর্যন্ত অনাহত রেখেছে কারণ বিজ্ঞানের ধর্মে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণসম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান ঈশ্বরকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না; অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ঈশ্বরের 'স্বাভাবিক মৃত্যু' না ঘটলেও অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বিজ্ঞান তাঁর পাশ কাটিয়ে গিয়ে তাঁকে বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত করে দেবে।

একালের ধর্ম্মীয় উৎসব

গত কয়েকবছর ধরে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবগুলিতে অদ্ভুত বিকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা স্বভাবতই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন এবং তাঁদের একাংশ সব কিছুর দোষ আধুনিক যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পুরাতন (বা 'সনাতন' ?) তপোবনের যুগে ফিরে যাবার সুপারিশ করছেন। এই উৎসবগুলির মধ্যে যে-বিকৃতি দেখা যাচ্ছে তা সমাজবিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয় একথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এক শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ যে রকম 'গেল গেল' আওয়াজ তুলে সামাজিক পশ্চাদপসরণের দাওয়াই দিচ্ছেন, সেই বিধান কতখানি সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

প্রসঙ্গত বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা স্বভাবতই এসে পড়ে। ভারতীয় সমাজধারা যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় গভীর ফাটল ধরেছে। সামাজিক যুগ-সন্ধিক্ষণ স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা অদ্ভুত একথা অনস্বীকার্য! সম্ভবত বৃটিশ শাসন এই পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা বৃটিশ রাজশক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফলে সামাজিক প্রগতিও বহুলাংশে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবুও ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এদেশে অনিবার্যভাবে পড়েছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থে সৃষ্ট রেল ও ডাক-ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ওপর কঠিন আঘাত করেছে। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন এক শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যাঁরা দেশের ভাবধারা এবং মূল্যবোধকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করেছেন। তাছাড়া গড়ে উঠেছে কতকগুলি নগর যাদের বর্তমান সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো বহুলাংশে ধনতান্ত্রিক। সমগ্র দেশের উপর এইসব নগরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও তুচ্ছ নয়। মোট কথা, বলা চলে যে দেশের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হওয়া সত্বেও প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এদেশে একটা বর্ণসংকর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যে সভ্যতায় সর্বাঙ্গীনতার নিতান্ত অভাব। এই সভ্যতার আওতায় নগরেও ধনতান্ত্রিক সমাজধারা সম্পূর্ণতা পায়নি। একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের ব্যবসায়িক ধারা (Finance Capital) অগ্রসর, অন্যদিকে শ্রমশিল্প (Industry) তুলনায় নিতান্ত শৈশবে। আবার বহুকালব্যাপী বৈদেশিক শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত, যার প্রতিক্রিয়া ইংরেজ রাজত্বের অবসানের দশ বছর পর এখনও অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক নগর-জীবিকায় অবশ্য সামন্ততন্ত্রের কোন পরিচয় নেই, কিন্তু দেশের বৃহত্তর সমাজমানসের প্রভাবে নগরের মানুষ এখনো পুরাতন গ্রামীণ সভ্যতার মূল্যবোধ বিধি-বিধান এবং সামাজিকপ্রথা আঁকড়ে ধরে আছে, যদিও যথার্থ জীবনের সঙ্গে যোগ নেই বলে এই মূল্যবোধসমষ্টি এবং সহচারী অনেক সামাজিক প্রথা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হ'য়ে একে একে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

ফলে ভাবধারায় এক অভূতপূর্ব অশান্তি এসেছে। পুরাতন বিচার, মূল্যবোধ আর বিশ্বাসকে আর মেনে নিতে পারছি না। প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলির তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাবার দাখিল, উচিত অনুচিতের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত। অথচ নাগরিক নববিধানের পঙ্গুতায় নূতন কোন সমাজব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী নূতন মূল্যবোধ-সমষ্টি গড়ে ওঠে নি।

এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। নগরসমাজে আমাদের আনন্দের উপকরণ অসংখ্য এবং অনায়াসলভ্য। কিন্তু বিশৃঙ্খলমানস

আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত নয়। নাগরিক আমোদ প্রমোদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের আনন্দদায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে। আনন্দ-কামী অতৃপ্ত মন বৃথাই এক উপকরণ থেকে অন্য উপকরণে ছুটোছুটি ক'রে আনন্দ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এই অবস্থা প্রায়শঃই দৃষ্টিভঙ্গিকে পশ্চাদাভিমুখী করে তোলে। ইতিহাসের অসম্পূর্ণ ধারণায় অতীতের সব কিছুই মধুময় বলে মনে হয়। আগে বারো মাসের তের পার্বণের মধ্যে যে আনন্দ পেতাম, মরিয়া হয়ে শেষে সেই উৎসবগুলির মাধ্যমে আনন্দের সন্ধান করি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠান বর্ণসংকর সভ্যতার পঙ্গুতায় অর্থহীন বিকৃত উল্লাস ছাড়া আর কিছুই আমাদের দিতে পারে না।

আগে দোল-দুর্গোৎসব ও 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' ঋতু-পরিবর্তনের মতই সহজ নিয়মে আসত যেত। সাধারণ মানুষ সহজ নিয়মেই উৎসব পালন করত সংশয়বিহীন সহজ আনন্দে। উৎসবের যথার্থতা নিয়ে তারা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল না, উৎসব পালনেই ছিল তার সার্থকতা। বর্তমানে সব কিছুই আমরা দেখি প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে বিচার করে, তাই আনন্দও হিসেবের খাতায় বন্দী। আধুনিক আনন্দ ব্যক্তিভিত্তিক, তার সমষ্টিগত রূপ ক্রমশঃ বিলুপ্ত। এই পরিস্থিতিও অস্বাভাবিক নয়। স্থৈতিক সমাজে, যখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস দৃঢ়তর থাকে, বৈষয়িক জীবনে স্বাভাবিক প্রাচুর্য থাকলে সামাজিক প্রথা-উৎসবাদি সহজ নিয়মেরই অনুগামী হবে এটা আশা করা যায়, কিন্তু পরিবর্তনমুখী সমাজে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। ব্যক্তিভিত্তিকতা ধনতান্ত্রিক সমাজের অনুচর, বর্তমান ভারতীয় বর্ণসংকর সভ্যতায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ঔৎকট্যলাভ করেছে মাত্র।

প্রসঙ্গত একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-মানসের

ব্যবধান বিস্তর। গ্রাম-মানসের বৈশিষ্ট্য সৌহার্দ্যে—মানুষের মধ্যে সহজ সম্পর্কে। এগুলি নাগরিক মানসিকতা থেকে বিচ্যুত। নাগরিকের জীবনে দ্রুততা, জীবিকায় সহজ ব্যক্তি-সম্পর্কের বিলুপ্তি, মানসিকতায় আত্মপরায়ণতা এবং হৃদয়বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাগরিক আনন্দানুষ্ঠান বা আমোদ-প্রমোদ যে রূপান্তর দাবী করে সেই দাবী দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি প্রাচীন সামাজিক উৎসবগুলি মেটাতে কতদূর সক্ষম সে প্রশ্ন অবান্তর নয়।

প্রশ্ন উঠবে, কেন আগে কি নগর ছিল না? তখন কি নগরে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা হত না, না তখনও উৎসবের নামে এই উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল?

আগেও শহর ছিল, আর এখনও গ্রাম আছে। কিন্তু তাদের স্বরূপ আলাদা। আগেকার শহরকে এক হিসেবে বলা চলে গ্রাম্যশহর—গ্রামীণ সভ্যতার পীঠভূমি। আর এখনকার গ্রামেও পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। অন্তত আচারের বহিরঙ্গে যে একালের গ্রাম ভিন্নধর্মী নগরের অনুকরণকারী, তা স্পষ্ট। তাই আজ গ্রামের উৎসবের ধারাও নগরের অনুরূপ একই উৎকট উল্লাসে, রুচিবিকারে ও সৌন্দর্যহীনতায় পর্যবসিত।

স্বভাবতই মনে হবে, তবে কেন এই অস্থির সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে দিশাহারা পথ পরিক্রমা। প্রাক্তন সমাজে যদি একটা সুনির্দিষ্ট ভাবধারা ছিল বলে স্বীকার করি, যার ফলে সমাজমানসের এই অশান্তি অনুপস্থিত ছিল বলে ধরে নিই, তবে কেন সেই সমাজব্যবস্থাতেই ফিরে যাব না? যাঁরা এই মতাবলম্বী তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান যে সমাজ গতিশীল (Dynamic)। প্রাক্তন সমাজব্যবস্থায় যে পরিস্থিতি ছিল তা সামগ্রিকভাবে বর্তমানে উপস্থিত নেই, তার অনেক কিছুই বদলে গেছে। চাষ করার জন্য যে-চাষা লাঙ্গল কিনেছিল, সে যদি মিলে এসে কাজ নেয় তবে তার

লাঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা যে আর থাকবে না একথা মেনে নিতেই হয়। পৌরোহিত্যের জন্য যে ব্রাহ্মণ সম্মানার্হ সে যদি পাটের দালাল হয় তবে অন্যকারণে সে সম্মানার্হ থাকলেও পৌরোহিত্যের প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়ার কোন কারণ নেই। সমাজেও বৈষয়িক (economic) পরিস্থিতির রূপান্তর সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিস্থিতিকেই নবরূপায়নের সম্মুখীন করেছে।

তাই, আতঙ্কিত হবার কোন কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। ইতিহাসের নিজস্ব ধারায় সমাজ আপনার পথ ধরে এগোয়। শৈশবে বড় আনন্দে ছিলাম মনে করে কিশোরের পক্ষে খোকামি করতে যাওয়া হাস্যকর। আমাদের সমাজও পূর্ণতা লাভ করছে। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে নবকলেবরে ভারতীয় সমাজও আনন্দের নবরূপ উপলব্ধি করবে। ভারতে বৈদেশিক প্রভাব ও শোষণ সমাজে কিছুটা নূতন পরিস্থিতি ও অকালপক্কতা এনে দিয়েছে মাত্র। এখন স্বাভাবিক নিয়মেই সে দোষ শোধরাচ্ছে। অতএব, সামাজিক বহিরঙ্গে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলেই ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাকে সমর্থন করা চলে না। এই অবক্ষয় যেমন প্রাক্তন সমাজব্যবস্থার আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ তা তেমনি নূতন সমাজের আগমনীও ঘোষণা করছে।

দোল উৎসবের উৎস

পদ্মপুরাণে আছে কলিযুগে দোল উৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান। বস্তুতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে দুর্গোৎসব, গণেশচতুর্থী প্রভৃতি কয়েকটি উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে দোলোৎসবের চেয়ে প্রাধান্যলাভ করলেও, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে বিচার করলে দোলোৎসব বা হোলীকে সর্ব্বাগ্র স্থান দিতে দ্বিধা আসে না।

দোলোৎসবের সূত্রপাত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক এবং এ সম্বন্ধে নানা ধারণা এবং মতবাদও বিদ্যমান। পুরাণে কথিত আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এদেশে দোলোৎসবের প্রচলন করেন। বাংলাদেশে অনেকের ধারণা শ্রীচৈতন্যদেব দোলযাত্রার প্রবর্ত্তন করেন।

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণায় দোলকে বসন্তোৎসব, মদনোৎসব বা যৌবনোৎসব হিসেবে, কতকটা সামাজিক আইন কানুনের বাঁধন থেকে সাময়িক মুক্তি কামনার বহিঃপ্রকাশ বলে, ধরা হয়। সমাজের হাজার হাজার আইন কানুন বাধানিষেধের বেড়াজালে মানুষের প্রকৃত-মন (elemental mind) হাঁপিয়ে ওঠে। সে চায় মুক্তি, অন্ততঃ সাময়িক। বসন্ত ঋতু আবার এই মুক্তিকামনাকে দেয় আরো উস্কিয়ে। শীতের কঠোর নিষেধ উপেক্ষা করে যেই একটি কিশলয় উঁকি মারল, অমনি দেখতে দেখতে সারা প্রকৃতিতে যেন একটি বিপ্লব ঘটে যায়। লালে লাল হয়ে যায় সব। মানুষের মনেও লাগে প্রকৃতির এই রং-বদলের ছোঁয়া; মুহূর্ত্তে মনের রঙে আর বনের রঙে মেশামেশি হয়ে যায়। এমন দিনে হোলী না খেলে আর উপায় কি? মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় প্রকৃতির মধ্যে। এই দিনে সমাজের অনেকগুলি 'না' স্তিমিত-স্বর হয়ে আসে; শৃঙ্খলা যায় বহুল পরিমাণে তছনচ হয়ে; সযত্ন পারিপাট্যে শোভিত মানুষ নিজেকে উদ্ভট করে তোলে রঙ-বেরঙে।

সেই সঙ্গে 'পুরাতনের প্রতীক' বুড়ীর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়—ওঠে নবীনের জয়গান।

বাহ্যতঃ দোলোৎসবের এই যে ধারা, এই ধারার প্রচলন দেখতে পাওয়া যাবে সমস্ত দেশে, অন্ততঃ যেখানেই মানব সভ্যতা কৃষি-যুগের পর্যায়ে উন্নত হয়েছে। রোমের Saturnalia, মিশরের Phamenoth, গ্রীসে Phagasia থেকে স্থরু করে অধুনাকাল পর্যন্ত প্রচলিত ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে অনুষ্ঠিত 'মে-উৎসব' বা ভারতবর্ষের হোলী উৎসব একই ধারার ঐতিহ্যবাহী।

এই উৎসবগুলির অদ্ভুত আন্তর্জ্জাতিক সৌসাদৃশ্য স্বভাবতই ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জেমস টড সাহেবের মতে নোয়ার কিম্বদন্তীর সঙ্গে দোলযাত্রার এবং বিভিন্ন দেশের অনুরূপ উৎসবাদির যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। "The apotheosis of Noah, whom the Hindu styles 'Manu Vaivaswata'—the man, son of the sun, may have originated 'dol yatra' of the Hindus, the arl of Osiris, the ship of Isis amongst the Suevi, in memory of forty days noticed in the traditions of every nations of the earth" (Annals of Rajasthan. Chap XII). অনুরূপভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ দোলযাত্রার উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। সমস্ত মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু মনে হয় দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব বর্ত্তমান কাঠামোয় ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে এ তথ্য ঐতিহাসিকগণ পরিবেশন করতে পারলেও এই উৎসবগুলির আদিম উৎস সন্ধানের জন্য আমাদের অবশ্যই সমাজতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। সমাজতাত্ত্বিক-গণের মতে দোলোৎসব বা অনুরূপ উৎসবগুলির উৎস আরও গভীরে, মানবসভ্যতার আরও প্রাচীন স্তরে।

প্রথমতঃ দোলোৎসবের কাল-নির্বাচন সম্বন্ধে বিচার করা যাক

দোলোৎসব ফাল্গুন মাসের উৎসব। পদ্মপুরাণে ফাল্গুন মাসের চতুর্দ্দশীতিথির অষ্টমযামে অথবা প্রতিপৎ সন্ধিকালে দোলোৎসবের কাল নির্দ্দেশ করা হয়েছে।[১] এই ফাল্গুন মাসের নামকরণের মধ্যে দোলোৎসবের উৎপত্তির কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। ফাল্গুনী নক্ষত্র অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের নামকরণ করা হয়েছে। এই ফাল্গুনী বা ফল্গুন শব্দের উৎপত্তি স্পষ্টতঃই 'ফল' এবং 'গুণ' শব্দের আদিম অর্থ প্রজননশক্তির আধার বা লিঙ্গ। ইংরেজী Phallus শব্দ সংস্কৃত (বা প্রাক্‌সংস্কৃত ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা) ফল শব্দ থেকেই এসেছে। আমাদের শিবলিঙ্গের প্রতিরূপ হচ্ছে মিশরের Phallus of Osiris। প্রজননশক্তি-গুণ-সম্পন্ন যে মাস, তাই হচ্ছে ফল্গুন বা ফাল্গুন।

ফাল্গুনকে প্রজননশক্তি-সম্পন্ন মাস বলে ধরা হয়েছে কেন? প্রথমতঃ শীতাবসানে এই মাসে প্রকৃতির যে পুনরুজ্জীবন হয় তা' আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দৃষ্টি এড়ায় নি। তা' ছাড়া ইন্দো-ইরাণীয় গোষ্ঠী এই সময়েই ফসল ঘরে আনত বলে মনে হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ঋতু ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে। "অয়নের সহিত ঋতু পিছাইতেছে। কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে," (পূজাপার্ব্বন)। এই গণনা অনুযায়ী চার হাজার বছর আগে নবান্ন উৎসব (যা এখন পৌষসংক্রান্তিতে হয়) ফাল্গুন মাসেই হবার কথা। কাজেই ফাল্গুন মাসেই যে পুরাকালে শস্যোৎসব হত এ রকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এই শস্যোৎসব, মদনোৎসব বা ফলনোৎসব (fertility rites) মূলত একই, এই সমস্ত উৎসবের পেছনেই

---

(১) চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হতে পারে,

"চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরি

দোলারূঢ় সমভ্যর্চ্চ মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥ (গরুড় পুরাণ)

কিন্তু এই ব্যবস্থা স্পষ্টতই পরে সুবিধা অনুযায়ী করা হয়েছে।

থাকে মানুষের প্রাচুর্য্যের আকাজ্ক্ষা। ফলে প্রায়শঃই বিভিন্ন দেশের উৎসবগুলির মধ্যে ফলনোৎসবের বিভিন্ন ধারা মিশে গেছে। এই জন্যই দোলোৎসব ইত্যাদিতে আবীর বা লালরঙের প্রচলন, কারণ আবীর হচ্ছে ফলনের বা প্রজননশক্তির প্রতীকচিহ্ন (প্রসঙ্গত বলা যায়, বিবাহাদিতে সিন্দূর প্রভৃতি ব্যবহারের মূলেও আছে এই ফলনাকাঙ্খা)। হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূটিয়া জাতির শস্যোৎসব 'রোপাই' উৎসবের প্রধান উপকরণ আবীর।

এবার দোলোৎসবের নায়ক সম্বন্ধে বিচার করা যাক। দোলোৎসবের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বা কানাই। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, আবার বিষ্ণু এবং সূর্য মূলতঃ এক। বৈদিক সাহিত্যের একাধিক স্থানে একের গুণ অন্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। মাঘমাসে অনুষ্ঠিত 'ভাস্কর সপ্তমী'তে বিষ্ণুকে সূর্য্যরূপে পূজা করা হয় (বরাহ পুরাণ দ্রষ্টব্য)। আবার Diodorus-এর বর্ণনা অনুযায়ী মিশরের সূর্য্য দেবতার একনাম কন (Kan)। 'কন'-ই যে কনহই বা কানাই এ সিদ্ধান্ত স্বভাবতই করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এবং সূর্য্যের অভিন্নতার কথা মনে রাখলে দোলোৎসবের প্রাথমিক কল্পনার সূত্র আবিষ্কার করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। দোলে শ্রীকৃষ্ণ দোলেন, এই কল্পনাটি সূর্যের গতিবিধির প্রতীকমাত্র। সূর্য একবার উত্তরায়ণে, একবার দক্ষিণায়নে দোলেন। সূর্য যখন উত্তরায়ণে চলেন তখন পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মাসাধিককাল ব্যাপী এক উৎসবের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসবগুলি সমস্তই শস্যোৎসব বা ফলনোৎসব। সূর্য যখন উত্তরায়ণে চলেন তখন বসন্তাগমে প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের চোখে পড়েছে। এই সময় সূর্যেরও পুনরুজ্জীবন হয় বলে মনে করা হত। তা' ছাড়া শস্যের উপর সূর্যের প্রাণদায়ী সম্বন্ধও তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। এই সব কারণে সূর্যকেই সবদেশে শস্যদেবতা বলে পূজা করা হত। প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনকে বৎসরেরও পুনরুজ্জীবন

বলে ধরা হত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত কতগুলি উৎসবের কথা আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মে-উৎসব ইউরোপের সমস্ত দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুইডেনে অনুষ্ঠিত মে-উৎসবে দুইদল অশ্বারোহীর মধ্যে 'লড়াই' (mock fight) হয়, একদল শীতের পক্ষে, অন্যদল গ্রীষ্মের (বা বসন্তের) পক্ষে। বলা বাহুল্য, শীতের পক্ষ পরাজিত হয়। তারপর নৃত্য-গীতসহযোগে গ্রীষ্মের বিজয়োৎসব করা হয়। রাশিয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে Kostrubonko প্রভৃতি উৎসবগুলি বিভিন্ন নামে একই বাৎসরিক বা প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবনের উৎসব। Kostrubonko উৎসবে একটি তরুণীকে সবুজে সজ্জিত করা হয়। সে এক জায়গায় মৃতবৎ পড়ে থাকে আর একদল তরুণ তাকে ঘিরে করুণ সুরে গাইতে থাকে :

"Dead Dead is our Kostrubonko
Dead Dead is our Dear one"

হঠাৎ তরুণীটি লাফিয়ে উঠে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে গাইতে থাকে :

Come to life, Come to life has our Kostrubonko
Come to life, Come to life has our dear one.

এই তরুণীটি যে প্রকৃতির প্রতীক এবং উৎসবটি যে প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনের উৎসব, তা সহজেই বোঝা যায়[২]।

কুপালো উৎসবে কুপালোর একটি খড়ের মূর্ত্তি তৈরী করা হয়। তাকে নারীর পোষাকে সজ্জিত করে একটি কেটে-আনা-গাছের সামনে স্থাপিত করা হয়। গাছটিকে বলে Marena—এটি মৃত্যুর প্রতীক। তারপর কুপালোর গায়ে আগুন ধরিয়ে কুপালো আর মারেনাকে ঘিরে নৃত্যগীত উৎসব চলে। পরের দিন ভস্মাবশেষ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম উদাহরণ পৃথিবীর সব

(২) Cf. James Frazer, 'Golden Bough', Vol. II

দেশের বসন্তকালীন উৎসবের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ডে 'burning of the winter's grand mothers' (burning of the witch-ও বলে), বেলজিয়ম ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে Lenten fires এবং Easter fiires, স্কটল্যাণ্ডে Beltane fire প্রভৃতি অগ্নি-উৎসবগুলি সবই ঐ সব দেশীয় বসন্তোৎসব তথা শস্যোৎসবের সঙ্গে জড়িত। এই সব অগ্ন্যুৎসবগুলির সঙ্গে আমাদের হোলিকা-দাহ প্রথার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সব উৎসবের চেহারাই এক। সবই বসন্তকালীন উৎসব, সব উৎসবেই পুরাতনের (বা শস্যাত্মার) প্রতীক 'বুড়ী' (বা বুড়ীর ঘর) অথবা ডাইনীকে পোড়ান হয়, সব উৎসবেই নৃত্যগীত অন্যতম অঙ্গ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষণীয় এবং প্রায় সমস্ত উৎসবেই শস্যপ্রতীক দেবতা, বৃক্ষ বা সাজসজ্জা চোখে পড়ে।

এই সৌসাদৃশ্য কখনই আকস্মিক হতে পারে না। স্বভাবতই এই ধারণা করা যেতে পারে যে এই সমস্ত উৎসব আদি মানব-সভ্যতার অনেকগুলি অলিখিত অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। একথাও আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের পূর্ব্বসূরীরা শুধু আনন্দের জন্য এই সমস্ত উৎসবের প্রচলন করেন নি। তা' হলে এই ধরণের সাদৃশ্য ক্রমবহমান থাকা কখনই সম্ভবপর হত না। সমস্ত উৎসবগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে এই উৎসবগুলির সূত্রপাত সর্ব্বত্রই মানুষের নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনে।

সভ্যতার প্রাথমিক যুগেই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ মানুষের চোখে পড়েছে। প্রকৃতির জীবনমরণের সঙ্গে জড়িত তার বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এ সেই যুগ যখন তার ধারণা, এই বিশ্বের সমস্ত বস্তু, প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে, এবং সকলেই মানুষের মত কামনা-বাসনা-ভয়-লোভ সম্বলিত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের অধিকারী। কাজেই যেভাবে

মানুষকে সন্তুষ্ট করে বা লোভ দেখিয়ে (অথবা ভয় দেখিয়ে) তার দ্বারা কোন কাজ হাসিল করান যায়, তেমনি আদিম মানুষের ধারণায়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেও তোয়াজ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বশীভূত করে সে তার অভিষ্টফল লাভ করতে পারে। সমাজতত্ত্বে এই বশীকরণকেই Magic বা ইন্দ্রজাল বলা হয়। কোন প্রাকৃতিক ঘটনার অনুকরণ করে সংশ্লিষ্ট শক্তিকে সেই ঘটনা সংঘটিত করতে প্ররোচনা করাও এইরূপ ইন্দ্রজাল পদ্ধতি। প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য—যার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত তার জীবনধারক শস্যের ফলন—মানুষ যে নানা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেবে তা স্বাভাবিক। এইভাবে, অন্যান্য সমস্ত পূজাপার্ব্বণ এবং সামাজিক উৎসবের মত দোলযাত্রারও সূত্রপাত ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার মধ্যেই। প্রকৃতির অনুকরণ করে যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হ'তো তাকে ফ্রেজার 'Homeopathic' বা Imitative magic' আখ্যা দিয়েছেন। ছোটনাগপুরের ওরাঁওদের 'ধুরেত-শিকার' বা 'ফাগুসেণ্ডা', রাজপুতদের 'গঙ্গোরী' কিম্বা গুজরাতীদের 'গর্ব্বা' উৎসব, এ সমস্তই imitative magic এর উদাহরণ। আদি মানুষের ধারণা ছিল (যেমন এখনও ওঁরাওদের মধ্যে ধারণা আছে) রক্তের মধ্যে প্রজননশক্তি বা জীবনদায়ীশক্তি লুকিয়ে আছে। অতএব কোন প্রাণীকে কেটে টুকরো টুকরো করে যদি ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বা শুকনো মাংস গুঁড়ো করে যদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে প্রচুর ফসল ফলবে (পরে প্রজননশক্তির প্রতীক আবীরের মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত)। এই বিশ্বাসেরই পরিণতি 'ফাগুসেণ্ডা' বা 'আহেরিয়া' (রাজপুতানা)। এই সূত্র ধরে বিচার করলে বিভিন্ন দেশের পুরাকাহিনীগুলির (mythology) তাৎপর্য্য ধরতে পারা যায়। বুঝতে পারি বিভিন্ন দেশের পুরাকাহিনীগুলির সঙ্গে যে সব পৌরাণিক নায়ক বা দেবতা জড়িত

—যেমন সিরিয়া, সাইপ্রাস এবং গ্রীসে Adonis, মিশরে Osiris, ফ্রিজিয়ায় Attis, রোমে Saturn, বা গ্রীসে Dionysus অথবা Bacchus, (যারা প্রত্যেকেই সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে শস্যপ্রতীক বলে অনুমিত[৩]) তাদের প্রত্যেককেই কেটে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলার এবং তাদের পুনরুজ্জীবন কাহিনী সর্বদেশের পুরা-কাহিনীতেই এত প্রাধান্য লাভ করল কেন[৪]।

কারণ আর কিছুই না, এই কাহিনীগুলি শস্যদেবতাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টারই রূপকমাত্র। শস্যের মধ্যে তার আত্মা (corn spirit) আছে বলে বিশ্বাস করা হ'ত। সমস্ত ফসল কেটে নিয়ে এলে শস্যের মৃত্যু ঘটবে এবং মৃত্যুর পর শস্যের আত্মাও ক্ষেত ছেড়ে চলে যাবে বলে ধারণা ছিল। তাই তাকে তার দেহের টুকরোর মধ্যে বা ভস্মাবশেষের মধ্যে ধরে রাখার জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করা হ'ত। এই শস্যাত্মাকেই বিভিন্ন দেশে শস্যমাতা (corn mother), বুড়ী (old woman) "ঠাকুমা" (grand-mother) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্লাভদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে শস্যাত্মাকে 'Rye-mother,' 'Wheat mother', 'Barley mother' ইত্যাদি শস্য অনুযায়ী বিভিন্ন

---

(৩) ফ্রয়েডীয় মতবাদী একদল সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। Margaret Mead, Geza Roheim প্রভৃতি অনেকের ধারণা Dionysus প্রভৃতি 'দেবতা বধ' কাহিনীর মধ্যে অথবা 'Bouphonia' (ষাঁড়কে হত্যা করে তার মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে সকলে ভাগ করে নেয়, পরে আবার সেই ষাঁড় হত্যার বিচার করা হয়—ইতালী, গ্রীস) প্রথার মধ্যে আদি মানুষের œdipus complex পরিণতি লাভ করেছে।

(৪) ভারতবর্ষেও উমার দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলার কাহিনীর মূলে সম্ভবত একই ইতিহাস। কারণ উমা (বা অন্নপূর্ণা ইত্যাদি) যে শস্যদেবী তা সুনিশ্চিত। প্রজননশক্তির দেবতা মদন ভস্মের কাহিনীও হয়ত একই ইঙ্গিত বহন করে।

নামকরণ করা হয়েছে। হ্যানোভার প্রভৃতি অনেক জায়গায় তাকে Great mother বা Harvest mother বলা হয়। উত্তর জার্ম্মানী এবং সাইলেসিয়াতে তাকে বলা হয় 'old man'। পোল্যাণ্ড এবং লিথুয়ানিয়াতে তাকে বলা হয় 'বাবা' (Baba) বা বোবা (Boba) —অর্থ বুড়ী। শস্যাত্মাকে যে শুধু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হিসেবেই কল্পনা করা হ'য়েছে তা নয়। বৃটেনের অনেক জায়গায় (যেমন ঃ Aberdineshire, Dumburtonshire বা Sutherlandshire) শস্যাত্মাকে Maiden বা কুমারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।[৫] আবার এই শস্যাত্মার কল্পনা শুধু ইন্দো-ইউরোপীয় দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইন্দোনেশিয়াতেও শস্যাত্মাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। বর্ম্মার কারেনগণ ধানের 'কেলা' (kelah) বা আত্মাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। সুমাত্রার Minangkabauerদের মধ্যেও ধানের আত্মাকে ('saning sari') ধরে রাখার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। চৈনিক নববর্ষে (বসন্তকালে) যে শস্যোৎসব হয় তাতে ষাঁড়ের একটি কাগজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তার মধ্যে পঞ্চশস্য ইত্যাদি পোরা হয়। তারপর রাজার (বা জমিদারের) উদাহরণ অনুসারে লাঠি এবং ইট পাটকেল দিয়ে ঐ ষাঁড়ের মূর্ত্তিটাকে ছিন্নভিন্ন করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়; পরে এর ভস্মাবশেষ পাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কারণ চৈনিকদের ধারণা, যে এই ভস্মাবশেষ পাবে সে সারা বছর সমৃদ্ধি লাভ করবে।

Saturn, Dionysus, Adonis প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যদেবতার মৃতদেহের টুকরো ছড়িয়ে ফেলার কাহিনী এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে খোণ্ড বা নাগাদের মধ্যে নরবলি দিয়ে নরমাংসের টুকরো ক্ষেতে পুঁতে দেওয়ার উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। মেক্সিকোতে ভুট্টা-দেবীর (Goddess of the White Maize বা Maize

(৫) James Frazer (Golden Bough)

Goddess) প্রতীকরূপে একজন কুমারীকে দুই দিন ধরে পূজা করে তাকে হত্যা করা হ'ত। শেষে তার রক্ত বিভিন্ন শস্যে মাখিয়ে দেওয়া হ'ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত এই সব বসন্তকালীন শস্যোৎসবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসি যে দোলাৎসব ইত্যাদি উৎসবগুলিও ইন্দ্রজাল-মূলক ফলনোৎসবেরই ঐতিহ্যবাহী। দোলোৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ হোলিকাদাহ এবং আবীর ও অন্যান্য লাল রঙের ব্যবহার এই ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষী।

অগ্নি-উৎসবগুলির সম্বন্ধে অবশ্য আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। Dr. Westermarck এবং Prof. Eugen Mogk প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে এগুলি আপদ বিদায়ের (Expulsion of evils) ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি। এই মতটি বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য, কিন্তু মনে হয় মূল ফলনোৎসবের সঙ্গে আপদ বিদায়ের পদ্ধতি মিশে গেছে। অন্য আর একটি মতে, আগুনকে সূর্যরূপে কল্পনা করে imitative magic-এর সাহায্যে শস্যোৎপাদনে সূর্য্যের সহায়তা কামনার অভিব্যক্তি বলে এইসব উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকের মতে আপদ-বিদায় এবং শস্যোৎপাদন এই দুই উদ্দেশ্যই সমানভাবে এই উৎসবের সূচনা করেছে।

> "The holi then appears to be a complex rite, the chief intention being to promote fertility and dispel evil influences...It seems more probable that these acts of indecency are intended as a piece of sympathetic magic to induce fertility, than as Crawley (Mystic Rose, 1902 p. 278) suggests, a means of purification and breaking with the past by a completely inversion of the normal, decent course of ordinary life". (W. Crooke—Encyclopaedia of Religion & Ethics—Dravidian Feasts and Festivals).

এই রকম আরো কয়েকটি মত আছে। যাই হোক, এগুলির সূত্রপাত যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ঘটেছে সে বিষয়ে মতানৈক্য এখন আর প্রবল নয়।

ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে প্রথার সূত্রপাত তা' পূজার পর্যায়ে কি করে উঠল সে পরিণতি সহজেই অনুমেয়। দোলোৎসব গোবিন্দের অর্চ্চনাও বটে। আগেই বলা হয়েছে যে মানবসভ্যতার আদি স্তরে মানুষের সম্ভবত বিশ্বাস ছিল যে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিকে বুঝি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়, অর্থাৎ দেবতা বা অপদেবতাকে (বা লোকোত্তর শক্তিকে) তুষ্ট করে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ অভিজ্ঞতাসূত্রে স্বভাবতঃই এই ধারণা শিথিল হল। মানুষ দেখল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের পিছনে শুধু তার ইন্দ্রজাল একমাত্র নিয়ন্তা নয়, এর নিয়ন্ত্রণ আরো কোনো এক মহত্তর শক্তির দ্বারা ঘটছে। এই মহত্তর শক্তির কল্পনাতেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি ঘটেছে। অবশ্য এই দেবতাদেরও সবকিছুই মানবোচিত, অর্থাৎ মানুষের মতই তাঁদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-জীবন—এক কথায় সবকিছু। ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় দেবতাদেরও সাহায্য করা যেতে পারে, এমন কি দেবতাদের পুনরুজ্জীবনলাভও সম্ভব। ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় শস্যদেবতার পুনরুজ্জীবনলাভে সহায়তা করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ শস্যোৎপাদন সুনিশ্চিত করত বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণ (বা সূর্যদেব) যে কৃষির দেবতা তা আগেই বলা হয়েছে। তা'হলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দোলোৎসবের সঙ্গে যে কাহিনী জড়িত তা' সমাজের বহু প্রাচীন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ারই জনপ্রিয় ঐতিহ্য বহন করে আসছে মাত্র।

এইভাবে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন উৎসবগুলির সঙ্গে একত্রে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই আমাদের দোলোৎসবও অন্যান্য

বিদেশীয় উৎসবগুলির মত মূলতঃ ফলনোৎসব বা শস্যোৎসব। তার সূত্রপাত ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং পরে তা' ধর্ম্মীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। আনুপূর্ব্বিক বিচার করলে একথা স্পষ্ট হবে যে এই উৎসবের সূত্রপাত কোন ভক্তিবাদ বা দেব-মাহাত্ম্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না; এর সূত্রপাত অন্যান্য সমস্ত সামাজিক উৎসবাদির মত আদি মানবগোষ্ঠীর নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদেই ঘটেছে।

শক্তিপূজার রূপান্তর

দুর্গোৎসব বাংলার সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। স্বভাবতই দুর্গোৎসব নিয়ে অজস্র আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার তুলনায় ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে যে আলোচনা হয়েছে, তা নগণ্য। ফলে দুর্গোৎসবের সূত্রপাত বলতে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, অতীতে সুরথ নামে এক রাজা বিপন্ন হয়ে দুর্গার আরাধনায় বিপদ-মুক্ত হ'ন এবং তারপর থেকেই বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। এই সুরথরাজার কাহিনীর যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এটা অনেকেরই অজানা (অবশ্য অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর মত সুরথরাজার কাহিনীর মধ্যেও ইতিহাসের উপাদান মিশে থাকা অস্বাভাবিক নয়)।

সুরথরাজার কাহিনীটি মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত। এই পুরাণের মধ্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যে আমরা দেখতে পাই যে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্র এবং দেবগণ বিপন্ন হয়ে পড়েন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর থেকে তেজ নির্গত হয়ে জ্বলনশীল পর্বতের ন্যায় দীপ্ত হয়ে উঠল ; তারপর সেই তেজোরাশি এক নারীরূপে আবির্ভূতা হলেন। তিনিই মহিষাসুর বধ করেন, তাই তাঁর নাম মহিষমর্দ্দিনী ; সকল দেবের সম্মিলিত শক্তি, তাই তিনি বিশ্বশক্তি।

এই কাহিনীটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সত্তা-বিচ্যুতির মাধ্যমে কিভাবে মানুষ দেবতার সৃষ্টি করে এই কাহিনীটি তার অপূর্ব উদাহরণ। ইন্দ্রাদি দেবতারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সত্তাকে খণ্ডিত করে এক সম্মিলিত শক্তি সৃষ্টি করলেন। এই ইন্দ্রাদি দেবগন প্রত্যেকেই আবার মানুষের বিভিন্ন আদর্শগুণের, তার বিচ্যুত সত্তার

প্রতীক।[১] অন্যভাবে দেখলে, এই কাহিনীটি হয়ত ইতিহাসের একটি অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের গোপন সাক্ষী। আমরা জানি যে, পুরাণাদির অনেক কাহিনীই আর্য-অনার্য সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। এই কাহিনীটিও এইরূপ একটি সংঘাতের ইতিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের অনার্য সমাজে বিভিন্ন টোটেম গোষ্ঠীর অসংখ্য চিহ্ন বর্ত্তমান। নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে টোটেমিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[২] মহিষাসুর বধের কাহিনী হয়ত কোন মহিষ-প্রতীক অনার্য টোটেম গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যগণের সংঘাতের কাহিনী। কে জানে, হয়ত দেবীর সিংহবাহিনী হবার আসল ইঙ্গিত এই, যে উপরোক্ত সংঘাতে আর্যগণ সিংহপ্রতীক কোন অনার্য গোষ্ঠীর সহায়তা পেয়েছিলেন; যেমন, অনার্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম বানর, ভল্লুক এবং হনুমান প্রতীক কয়েকটি অনার্য টোটেম-গোষ্ঠীর সহায়তা পেয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয় (পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই এখন রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সন্ধান পান)। আর্যগনের নিজেদের মধ্যেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনাতীত নয়। এই ভাবে দেখলে, সম্ভবতঃ সমস্ত আর্যগণ মিলিত হয়ে সিংহপ্রতীক কোন অনার্য টোটেম গোষ্ঠীর সহায়তায় পরাক্রান্ত মহিষপ্রতীক কোন অনার্য গোষ্ঠীকে পরাস্ত করেছিলেন; মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারই কাহিনী বর্নিত।

যাই হোক, দুর্গা বা শক্তিপূজার উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলে ধরা হলে নিতান্ত ভুল করা হবে। শক্তিপূজার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন এবং নিঃসন্দেহে প্রাগার্য। বেদ বা উপনিষদ, এমন কি

---

(১) সত্তা-বিচ্যুতি (alienation) নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পাঠকগণ এই বিষয়ে Eric Fromm-এর 'The Sane Society' গ্রন্থটি পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(২) 'দেব-রহস্য' প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। তা'ছাড়া এ সম্পর্কে অজস্র সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা আছে।

প্রাচীন কোন পুরাণেও দুর্গার কোন উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি যে সব পুরাণে দুর্গা বা চণ্ডীর উল্লেখ পাই তা অনেক পরবর্তী কালের। ঋগ্‌বেদে অবশ্য বাক্‌ দেবীর আরাধনা আছে। এই বাক্‌ দেবীই বেদোক্ত সরস্বতী, যিনি পরে লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, এবং ধৃতি এই অষ্টতনুতে কল্পিতা হয়েছেন (মৎস্যপুরাণ)। কিন্তু তবুও ঋগ্‌বেদের এই দেবীসূক্তকে শক্তিপূজার উৎস বলে নির্দেশ করা চলে না। শক্তিপূজার উৎস আরও গভীর। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (২৩ অধ্যায়) অর্জুন কর্তৃক দুর্গার স্তবে দেবী কোকমুখা এবং কান্তার-বাসিনী বলে বর্ণিতা, তিনি 'জম্মু', 'কতক' ও 'চৈত্য'-বৃক্ষের কাছে নিরন্তর বিরাজ করেন। 'কোক' অর্থে বন্যকুকুর। দুর্গার আর এক নাম 'শিবা' অর্থাৎ শৃগালী। বিন্ধ্যবাসিনী, কান্তারবাসিনী দুর্গা পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যে বাস করেন। বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন : "বৃক্ষ ও বন্যজন্তু, পর্বত ও অরণ্য দুর্গার ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িত। কেন জড়িত ? দুর্গার উৎপত্তি সেখান থেকে। আদিম অরণ্যবাসী ও পর্বতবাসীর ধ্যানের দেবতা দুর্গা।....পরে অনেক পরে, দুর্গা সমগ্র বাঙালী জাতির উপাস্য দেবী হয়েছেন। কান্তারবাসিনীর কথায় আমাদের বনদুর্গার কথা মনে হয়। বনদুর্গা বাঙালীর গৃহদুর্গায় পরিণত হয়েছেন। ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পৃ—৯৪) স্পষ্টতঃই মহাভারতের রচনাকালে এই অনার্য-পূজিতা দেবী আর্যসমাজে গৃহিতা হতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁর অনার্য আকৃতির রূপান্তর ঘটেনি। এক সমাজের দেবতা অন্য সমাজে, এমনকি উচ্চতর সমাজেও কিভাবে গৃহিত হন তার উদাহরণ আমাদের দেশে অসংখ্য। জাগ্রতা বলে ধারণায় কালী বাংলার নানাস্থানে খ্রীষ্টান, মুসলমান, এমনকি ইংরেজদের দ্বারাও যে পূজিতা হয়েছেন এরকম তথ্য অনেক সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দুরাও পীরের দরগায় পূজা দিয়েছে। লিঙ্গোপাসনা নিঃসন্দেহে

প্রাগার্য প্রথা। ঋগ্‌বেদে 'শিশ্নদেব' বলে যে লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে তারা ইন্দ্রের বিরোধী বলে বর্ণিত, অতএব আর্যদের বিরোধী অনার্য সম্প্রদায়বিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আর্যরা লিঙ্গের উপাসনা করতেন না। লিঙ্গের উপাসনার সঙ্গে পরে শিবের উপাসনা মিশে গেছে। এই শিবও অনার্য দেবতা বই অন্য কিছু নন। অথচ পরে আর্যসমাজে লিঙ্গরূপী শিবের আরাধনা অন্য অধিকাংশ দেবতার পূজাকে ছাড়িয়ে গেছে। মহাভারতোক্ত দুর্গা (বনদুর্গা) অথবা চণ্ডী যে অনার্য লোকসমাজের দেবতা ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যাবে ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের 'চাণ্ডী'-পূজার মধ্যে। ওঁরাওরা দ্রাবিড় জাতীয়। চাণ্ডীর মূর্ত্তি হল স্বাভাবিক একখণ্ড শিলা। চাণ্ডী বন্যপশুর দেবতা, শীকারের দেবতা। ওরাঁত্ত যুবকেরা যখন শীকারে যায় তখন একখণ্ড চাণ্ডীশীলা তাদের সঙ্গে থাকে। তাদের বিশ্বাস, সঙ্গে চাণ্ডীশীলা থাকলে শীকারে সাফল্য সুনিশ্চিত। দেবতার আরাধনায় ও ধর্ম্মে ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতির প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই চণ্ডীপূজা তথা আদিম শক্তিপূজা। দুর্গাপূজার বিভিন্ন আচারগুলি শক্তিপূজার প্রাগার্য ঐতিহ্যের প্রমাণ। দশরা অনার্যদের শস্যোৎসবের ধারাবাহী নব-পত্রিকা বৃক্ষপূজার ঐতিহ্য বহন করছে। নৈবেদ্যে ইক্ষুর ব্যবহার দেবীর প্রীত্যর্থে মদ 'ভোগ' দেবার পরিবর্তিত প্রথা মাত্র; তেমনি মাংস 'ভোগে'র জন্য বলিদানের ব্যবস্থা। "দেবীর প্রীত্যর্থে এই যে মদ-মাংসের ব্যবস্থা, এই যে আয়োজন—এ কিন্তু একেবারেই আর্যদের সংস্কার নয়। এটা সম্পূর্ণ ইন্দো-মঙ্গোল জাতি বা অনার্য 'কিরাত' জাতির সংস্কার।" (বিনয় ঘোষ, 'বাঙালীর দুর্গোৎসব', শারদীয় মুখপত্র, ১৩৫৯)। কিছুদিন আগেও দশমীর দিন শবরোৎসব হ'ত (এখন যা বিসর্জনের পর কাদা খেলায় পর্যবসিত হয়েছে)। এই প্রথা শবরদের ঐতিহ্য বহন করছে।

তা'ছাড়া দুর্গাপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে মানুষের আদিমতম সংস্কার—অলৌকিকের ভীতি। মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, কুদ্রা, ইত্যাদি যে সব গ্রামদেবতার পূজা আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় তা এই সংস্কারেরই ধারাবাহী। যে শক্তি আমার কাছে ভয়ঙ্কর, তা আমার শত্রুর পক্ষেও ভয়ঙ্কর; কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ঙ্কর দেবতাকে তোষণ করে তাঁর উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শত্রুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও আদিম মানবগোষ্ঠীতে লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদে রুদ্রের স্তবে এই ভাবে তাঁকে শত্রুবিনাশ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত অর্জুনের স্তবেও দেখি দুর্গার সমীপে তাঁর এই প্রার্থনা: "হে কান্তারবাসিনী, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করতে পারি," যদিও এই প্রার্থনায় দুর্গাকে সরাসরিভাবে শত্রুনিধনে অংশ গ্রহণ করতে বলা হয় নি, যা রুদ্রের স্তবে অথর্ববেদে লক্ষণীয়, তবুও শত্রুর বিনাশে দেবীর সহায়তা কামনা স্পষ্ট। এই ভাবেই ভয়ঙ্করী চণ্ডীর প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে শত্রুদলনী মহিষমর্দিনী দুর্গায়। যা বিশেষ ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক তা হল এই যে, অনার্য সমাজের দেবী আর্যসমাজে গৃহীতা হবার পর অনার্য-নিধনেই নিযুক্তা হলেন। দুর্গার এবং শক্তিপূজার রূপান্তর অতি বিচিত্র। ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে শক্তিপূজার বিভিন্ন রূপান্তর ঘটেছে। সহস্র সহস্র বছরের সেই বিপুল ইতিহাস, ভারতবর্ষের এবং বাংলার ক্রমাগত সামাজিক সংঘাত এবং ঘাতপ্রতিঘাতের বিচিত্র অধ্যায়, একটি অপরিসর প্রবন্ধের মধ্যে যথাযথভাবে উপস্থিত করা অসম্ভব। আমরা আপাততঃ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এই রূপান্তরের ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান পর্যায়ের উল্লেখ করে এই বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করতে চাই।

মহিষমর্দিনী দুর্গা নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্করী চণ্ডীর পরিণত রূপ, কিন্তু

আমাদের 'মা-দুর্গা'ত শুধু মহিষমর্দিনী নন, তিনি সেই সঙ্গে একাধারে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, পরমেশ্বরী ভবানী, হরপ্রিয়া গৌরী এবং হিমালয়দুহিতা উমা। দেবীর এই বিচিত্র রূপের তাৎপর্য সহজে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না যতক্ষণ না আমরা এদেশের সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানে তৎপর হই।

প্রথমতঃ এই অন্নপূর্ণা কল্পনার কথা বিচার করা যাক। অন্নপূর্ণা শস্যদেবী। শস্যোৎসব অতি প্রাচীন উৎসব, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে শস্যোৎসবের প্রচলন ছিল। শস্যোৎসব আর প্রজননোৎসব মিশে ফলনোৎসবে (fertility rites) পরিণত হয়েছে। এই ফলনোৎসবের আচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালমূলক[৩]। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মনে করতেন যে অলৌকিক শক্তিরাও মানুষের মতই সমস্ত জৈবিক নিয়মের অধীন। তারা যেমন রাগ-দ্বেষ-লোভ-ভয় ইত্যাদি মানসিক গুণসম্পন্ন, তেমনি তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-প্রজনন ইত্যাদিও মানুষের মতই ঘটে। তাই শস্যদেবীকে শস্য-প্রসবিনী করার জন্য তাঁর বিবাহ এবং স্বামীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই হর-গৌরীর মিলন কল্পনার সূত্রপাত। হরগৌরীর মিলন-সূচক অজস্র উপকথা, উৎসব ইত্যাদি আমাদের দেশে প্রচলিত ; তার মধ্যে রাজপুতানার 'গঙ্গোরী' উৎসবের মত ঐন্দ্রজালিক ঐতিহ্যের এত সুস্পষ্ট নিদর্শন বোধ হয় অন্য কোনটি নয়[৪]। শিবের ঘরণীরূপে পার্বতীর যে পূজা তার মূলে এই ঐন্দ্রজালিক প্রথা। সমস্ত দেবতার মধ্যে শিবকে কেন পার্বতীর স্বামীরূপে নির্বাচন করা হল তা'ও গবেষণা সাপেক্ষ। শিব অনার্য দেবতা। অনার্যদের মধ্যে শস্যদেবী থাকা অসম্ভব

---

(৩) James Frazer-এর 'The Golden Bough' এবিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(৪) এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য James Todd-এর Annals of Rajputana, Vol. II Chap. XXI দ্রষ্টব্য।

নয়, কিন্তু চণ্ডী প্রভৃতি দেবীরা, যাঁরা পরে দুর্গার সঙ্গে মিশে গেছেন তাঁরা কেউই শস্যদেবী নন। বস্তুতঃ অন্নপূর্ণা আর্যদের শস্যদেবী (পৃথিবীর অন্যত্রও শস্যদেবীর রূপকল্পনা এবং পুরাকাহিনীর সঙ্গে অন্নপূর্ণা বা গৌরীর[৫] কল্পনা বা কাহিনীগুলির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। গ্রীক দেবী Dianaও দেবী অন্নপূর্ণার অপভ্রংশ বলে James Todd মনে করেন: from Devi Anna—Diana। ভারতে আর্য-অনার্য সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে শান্তি এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে, সেই প্রয়োজনীয়তার সূত্রেই হরগৌরীর এই মিলন ঘটেছে কিনা কে জানে ? এই প্রসঙ্গে পরবর্তীযুগে শাক্তধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ের একাধিক উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। যেমন, দুর্গার 'যোগনিদ্রা' বা 'নিদ্রাকল্পরূপিণী' কল্পনা ; শ্রীকৃষ্ণ যোগনিদ্রার সহায়তায় কংসের হাত থেকে নিস্তার পান (হরিবংশ)। মধু-কৈটভের কাহিনীর মধ্যেও এই ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

পরমেশ্বরী ভবানী কল্পনাও সামাজিক ক্রমবিকাশের প্রতিচ্ছবি মাত্র। মানুষের রাজনৈতিক জগতে ছোট ছোট গোষ্ঠী বা অঞ্চল যখন ক্রমশঃ বিরাট রাজ্যের অন্তর্গত হতে আরম্ভ করল, তখন সেই সব রাজ্যের অধিপতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেবকুলেও ক্রমশঃ দেবরাজ এবং শেষ পর্যন্ত মহাদেবের সূত্রপাত ঘটল। পৃথিবীতে রাজাধিরাজের প্রতিরূপ পরমেশ্বর, এবং পরমেশ্বরের পত্নী পরমেশ্বরীর রূপ নিল। স্বভাবতঃই কল্পনা বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়, তাই ইহজগতের যে কোন সম্রাটের চেয়েও পরলোকের পরমেশ্বরের আধিপত্য অনেক বেশী বিস্তৃত। হিমালয়দুহিতা উমার কল্পনা বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি, বিশেষত চৈতন্যের প্রেম-ধর্মের প্রভাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

---

(৫) গৌরী অর্থ উজ্জ্বল স্বর্ণাভ বর্ণ, যা পাকা ধান বা গমের মধ্যে দেখা যায়। গৌরী যে শস্যদেবী তা নামেই স্পষ্ট।

শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি-কোণেই সীমাবদ্ধ। শক্তিপূজা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশেই বিশেষভাবে পরিণতি লাভ করেছে। তাই ঐতিহাসিক ধারায় আলোচনা করতে গেলে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এবিষয়ে যথার্থ গবেষণার শোচনীয় অভাব আছে। প্রাগার্য কাল থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ক্রমবিকাশের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয় নি। এই বিস্তৃত কালে শক্তিপূজার ক্রম-বিকাশ বাংলাদেশে কি ভাবে রূপ নিচ্ছিল তা গবেষণা-সাপেক্ষ। মৌর্যযুগে ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে-ধারাই বর্তমান থাকুক, উচ্চতর সমাজে শাক্তধর্মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, অথচ এইযুগে (মৌর্যোত্তর যুগে) ভারতের বাণিজ্য গৌরবের চরম শিখরে। দেশময় বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সওদাগরী ধনতন্ত্রের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এদিকে বৌদ্ধধর্মও নানাকারণে বিনষ্টপ্রায়। গুপ্তযুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটল। সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমন্বয় এবং ঐক্যের এই চাহিদা মিটিয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। গুপ্তযুগেও শ্রেষ্ঠীরাই রাষ্ট্রের নিয়ন্তা ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। "এই যুগে বাংলার সামাজিক ধন শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের আয়ত্তে এবং সেই ধনেই রাষ্ট্র পুষ্ট; সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইঁহাদের পোষক ও সমর্থক, ইঁহারাও তেমনি রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক।

শুধু ভূমি ক্রয় বিক্রয় দানের ব্যাপারে নয় স্থানীয় সকল ব্যাপারেই এই সমাজ অন্যতম কর্তা। এমন কি দেখিলে মনে হয়, রাজ-পুরুষকেও বোধ হয় ইহাদের নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে হইত।" (ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙ্গলীর ইতিহাস' পৃ ৪৪৮)। শ্রেষ্ঠিতন্ত্রের যুগে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি দেশকে প্লাবিত করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সময়েও শাক্ত ধর্মমত কোথাও বিশেষ পাত্তা পায়নি। বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া বৌদ্ধধর্ম তখন পর্যন্ত সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। এসব লক্ষণ দৃষ্টে আমরা বলতে পারি যে শাক্ত মত শ্রেষ্ঠিতন্ত্রের অনুকূল নয় বলেই সে সময়ে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হূণেরা ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিল। এই সময়ে বাংলাদেশের ওপর গুপ্তরাজাদের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ল এবং দেশে আবার ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়। এই সুযোগ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ ও গৌড় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল। এই সময়েই যে বাংলায় সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ সুলভ। সামন্ততন্ত্র নিঃসন্দেহে শক্তিপূজার অনুকূল, কারণ দেশের শাসনব্যবস্থা যখন সামন্তশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন সামন্তরাজাদের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে অলৌকিক শক্তির সাহায্য আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক[৬]। এই

---

(৬) শক্তি পূজার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। "যে সময়ে কবিকঙ্কন-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থান-পতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হ'ত। তখন চারিদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোনদিন যে কি আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানের ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডী-শক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত এক শ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণী-ভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার দিনের শক্তির ঝ তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।" (কালান্তর-পৃঃ ১৪৮)

যুগেই বাংলা দেশে শক্তিপূজার সূত্রপাত হয় বলে মনে হয়, কারণ শক্তিপূজা যে সপ্তম শতাব্দীর আগেই রাঢ়া, বারেন্দ্র, কামরূপ, কামাখ্যা এবং ভোট্টদেশে (তিব্বত) প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল তা'র উল্লেখ আমরা সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত দেবীপুরাণ থেকে পাই। (শক্তিপূজা যে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রচলিত হয়নি, সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে)।

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাসামন্ত শশাংক গৌড়ের স্বাধীন রাজা হিসেবে দেখা দেন। এই সময়ে বঙ্গে প্রথমে খড়্গ-বংশ ও পরে লোকনাথবংশ, এবং সমতটে রাত-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাংক ছিলেন শৈব। খড়্গবংশ বৌদ্ধ হলেও তাঁরা শৈব ধর্মের অনুকূল ছিলেন। লোকনাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব আর রাত-বংশও ছিলেন বৈষ্ণব। এই যুগেও ধর্ম সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক কাঠামো রূপান্তরের মুখে, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ পাল্টায় নি। "দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এখনও বিদ্যমান, তবে সে আধিপত্য এখন অন্যান্য স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করা হইতেছে।" ('বাঙ্গালীর ইতিহাস', পৃ-৪৬১) এই 'শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী'দের আধিপত্যের জন্যেই, সপ্তম শতাব্দীতে শক্তিপূজার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের অপ্রতিহত প্রাধান্য দেখা যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সামন্ততন্ত্র পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশই সম্পূর্ণভাবে কৃষি-প্রধান হ'য়ে ওঠে। এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নীহার বাবু বলেছেন, "দেশের অর্থ সম্পদ ছিলনা, একথা সত্য নয়, কিন্তু এই অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ নয় বলিয়াই মনে হয়—ভূমিলব্ধ, কৃষিলব্ধ সম্পদ।...মোটের উপর দেশের সামাজিক ধন ক্রমশঃই

যে উত্তরোত্তর কৃষিলব্ধ ধনে বিবর্তিত হইতেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ পরবর্তী পালযুগে বাংলার সমাজ প্রধানত কৃষি এবং গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে, অধিকাংশেই কৃষিনির্ভর, কারণ রাষ্ট্রে কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের স্থান যদিবা উল্লেখিত হইতেছে, শিল্পী বা বণিক সমাজ পৃথকভাবে উল্লেখিত হইতেছে না। দেখা যাইবে ভূমির চাহিদাও পরবর্তী কালে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে।" এই সময়ে যে শাক্ত ধর্মমত বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে তার সাক্ষ্য পাই আমরা তখনকার অসংখ্য দেবীমূর্তি এবং শিলালিপি থেকে। এই যুগের পর থেকেই এদেশ শক্তি-ধর্মের সর্বপ্রধান ঘাঁটি হিসেবে গড়ে ওঠে। এদিকে আবার এই সময়েই শক্তিপূজার মূল-ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই যুগে বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পালপর্বের অসংখ্য দেবীমূর্তির রূপকল্পনা এসেছে আগম ও যামল গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শৈব ধর্ম থেকে। "পালপর্বের বাংলাদেশে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তি রূপ বাঙ্গালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল।" তান্ত্রিক ছোঁয়াচও লেগেছে এই সময়েই। মাৎস্যন্যায়ের পর দেশে ঐক্য এবং সমন্বয়ের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, এই ধর্মসমন্বয় ঘটেছিল সেই চাহিদা মেটাতেই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই যুগেই রণচণ্ডী মহিষমর্দিনী বাংলাদেশে সর্বমঙ্গলা মাতৃরূপে দেখা দিয়েছেন বলে অনুমিত হয়।

এর পর কয়েক শতাব্দী পার হয়ে দুর্গাপূজার সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন যোড়ষ শতকের প্রারম্ভে। বাংলাদেশ তখন সদ্য সদ্য এক বিশৃঙ্খলার জগত থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশময় অরাজকতার সুযোগে হাবসীরা[৭] নানা জায়গায় উৎপাত করছে; দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার অভাব অত্যন্ত প্রকট।

(৭) সুলতান রুকনউদ্দিনের আমলে আবিসিনিয়া থেকে প্রচুর হাবসী এদেশে ক্রীতদাস রূপে আনীত হয়। এরা পরে ক্রমশঃ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

তান্ত্রিক গুহ্যসাধনা দেশময় ছেয়ে গেছে, দেশের নৈতিক মানের চরম অবনতি ঘটেছে। শেষে ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ সুলতান নির্বাচিত হয়ে দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। ধর্মীয় এবং নৈতিক নৈরাজ্য থেকে মুক্তি এল শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে। তাঁর প্রেমধর্মের প্রভাবে শক্তিপূজার কল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটল। "শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে শক্তি-উপাসনাতেও অচিরে ভক্তিরসের সঞ্চার হ'ল। তান্ত্রিকতা লুপ্ত হ'ল না বটে কিন্তু তার বিষদাঁত গেল ভেঙ্গে, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্কে ভয়-ভক্তির স্থানে বাৎসল্য-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। চৈতন্য বন্দনা দেবীমঙ্গল কাব্যের উপক্রমে স্থানলাভ করল।" (সুকুমার সেন—'মধ্য যুগের বাঙ্গালী', পৃ-৩৮)

বৃটিশ যুগে বাহ্যতঃ শক্তিপূজার উল্লেখযোগ্য আর কোন বিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। একথা বললে হয়ত সত্যের অপলাপ হবেনা যে, ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় গ্রামীন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা বৃটিশ রাজশক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফলে সামাজিক প্রগতিও পঙ্গু হয়ে থাকে। তবুও ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যন্ত্রসভ্যতার ছাপ এদেশে অনিবার্যরূপে পড়েছে। ইংরেজদের সাম্রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থে সৃষ্ট রেল এবং ডাক ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ওপর কঠিন আঘাত করেছে। সেইসঙ্গে ইংরেজীশিক্ষা এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যারা দেশের ভাবধারা এবং মূল্যবোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তা'ছাড়া গড়ে উঠেছে কতকগুলি নগর, যার সমাজিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবেই ধনতান্ত্রিক। সমগ্র দেশের ওপর এইসব নগরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। মোট কথা, বলা চলে যে দেশের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হওয়া সত্বেও প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংশ্রবে এসে এদেশে একটা বর্ণসংকর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে পুরোনো মতাদর্শের উপর বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে, পুরোনো মূল্যবোধসমষ্টিতে গভীর ফাটল ধরেছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো না বদলানোর ফলে নূতন মূল্যবোধসমষ্টি এখনও গড়ে ওঠেনি; সেই পুরোনোকেই এখনো আঁকড়ে ধরে আছি, কারণ সম্ভাব্য নূতন এখনও অনাগত। স্পষ্টতই ভাবধারায় একটা বিপর্যয় এসেছে। এই হচ্ছে বৃটীশ রাজত্বের অন্তিমে সমাজ-মানসের ছবি। ধর্মের ক্ষেত্রে তাই আমরা পূজা-পার্বণ করেছি প্রথাগতভাবে, কিন্তু তার ধর্মীয় তাৎপর্য প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। দুর্গাপূজা ক্রমশঃই অন্যান্য দেবতার পূজাকে কুক্ষিগত করে বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্গাপূজার সঙ্গে তেত্রিশ-কোটী দেবতার পূজাও এখন দুর্গাপূজার অঙ্গ। এটা ঘটেছে তার সার্বজনীনতার সঙ্গে তাল রেখে; অর্থাৎ যেমন ক্রমশঃ দুর্গাপূজার মধ্যে সর্বসাধারণকে টানা হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মতের সমন্বয় ঘটাবার জন্য সব দেবতাকেই টানতে হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪০-৫০ সাল একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, গণ-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা এবং দেশবিভাগ জনিত অগণিত জনতার বাস্তুত্যাগ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা ওলট্পালট করে দিয়েছে। একথা বাংলাদেশের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যতই বাধাদানের চেষ্টা করুন না কেন, দেশ সুনিশ্চিতভাবে শিল্পায়নমুখীন। দেশের শ্রমশক্তি তেমনি সুনিশ্চিতভাবে শৈশব কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে; কিষাণ আন্দোলনের মুখে নূতন কৃষি-ব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ যেন জোয়ারের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্ত—আসন্ন জোয়ারের মুখোমুখী এসে ভাঁটার স্রোত মন্দীভূত হয়ে পড়েছে।

এই সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে তাল রেখে রূপান্তরিত হয়েছে

শক্তিপূজা। আজ যে দুর্গাপূজা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রাথমিক শক্তি পূজার আমূল প্রভেদ। আজ দুর্গাপূজার সঙ্গে ধর্মের যোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে। প্রথমে শক্তিপূজার গণতান্ত্রিক কোন ভিত্তি ছিল না, একথা বলা চলে। এখন শক্তিপূজা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, সার্বজনীন। তাছাড়া দুর্গার মূল রূপকল্পনা বদলে গেছে সম্পূর্ণ। ভয়ঙ্করী চণ্ডী দেখা দিয়েছেন কল্যাণী উমারূপে, আমাদের 'ঘরের মেয়ে'।

শক্তিপূজার দীর্ঘ ইতিহাস অনুধাবন করলে দুর্গাদেবীর রূপান্তরের মধ্যে সঙ্গতি পাওয়া যায়। প্রথম রূপ দেখলাম কতকটা অপদেবতা হিসেবে। মহামারী প্রভৃতি দুর্যোগের পেছনে যে-শক্তি কাজ করে সেই অপদেবতাকে কোন রকমে তুষ্ট রাখাই এই প্রথম পূজার প্রেরণা। তাঁর প্রথম রূপান্তর ঘটল আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতে। দেবী ভয়ঙ্করী রইলেন, কিন্তু আর্যগণ তাঁকে আত্মসাৎ করে তাদের শত্রুদলনী, বিপত্তারিণী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করল। পালপর্বে ঘটল দ্বিতীয়বার রূপান্তর। রণরঙ্গিণী দূর্গা দেখা দিচ্ছেন সর্বমঙ্গলা মহেশ্বরীরূপে। কারণ কি? তখনকার সমাজের দিকে তাকালেই এর কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। পালযুগ বাংলার সমৃদ্ধির যুগ। পাল সম্রাটের সুশাসনে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ আশংকা কম, দেশে শান্তি বজায় ছিল। এই অবস্থায় দুর্গার চণ্ডীরূপ স্তিমিত হয়ে আসাই স্বাভাবিক। তা' ছাড়া ধর্মসমন্বয়ের চাহিদাতে শৈব এবং বৌদ্ধধর্মও শাক্তধর্মকে নিরীহ করে দিল। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দেবীর শত্রুদলনী রূপের চেয়ে কল্যাণী রূপই বেশী প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হ'ল। তৃতীয় রূপান্তর ঘটল চৈতন্য দেবের ধর্মের প্রভাবে। এই সময় বৈষ্ণব ধর্মে দেবতা ও মানুষের দূরত্ব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। দেবতা ঘরের মানুষ হয়ে দেখা দিচ্ছেন। চৈতন্য-ধর্মের প্রেমের বন্যায় মানুষে-মানুষে ভেদ যেমন ভেসে যাচ্ছে, তেমনি

দেবতা আর মানুষের ভেদও কমে যাচ্ছে। শিবের ঘরণী ভবানীর হৈমবতীরূপ প্রাধান্য পাচ্ছে, দেবী যেন আমাদেরই ঘরের 'মেয়ে' হয়ে উঠেছেন। বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য আমাদের 'মেয়ে' ঘরে ফিরে আসে, তারপর আবার ঘর অন্ধকার করে দিয়ে পতিগৃহে ফিরে যায়। উমার এই যে নূতন রূপ এটা অত্যন্তই সামাজিক একথা অনস্বীকার্য। বৃটিশযুগের সামাজিক পরিস্থিতির (বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য) ফলে দুর্গাপূজার ধর্মীয় তাৎপর্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যে নূতন অবলম্বনের সৃষ্টি হয়েছে, তা' হল পূজার সামাজিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার নবরূপায়ণ সুরু হয়ে গেছে।

মোটামুটি দেখা গেল অন্যান্য যে কোন ধর্মের মতই আমাদের দেশে শক্তিপূজাও একান্তভাবেই সামাজিক পরিস্থিতি, বিশেষতঃ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া দেখা গেল শক্তিপূজা আদিম কৃষিসভ্যতা এবং সামন্ততন্ত্রের পরিবেশেই খাপ খায়, অন্য পরিবেশে নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে দুর্গাপূজার ভবিষ্যৎ কি? দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। পূজা হিসাবে দুর্গাপূজার আয়ুষ্কাল বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসবের আরো বহু কাল টিঁকে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

(৮) আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে ওলাইচণ্ডী, শীতলা প্রভৃতির পূজা এই অপদেবতার পূজার ঐতিহ্য বহন করছে।

(৯) চৈতন্য দেবের প্রেমধর্মও তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতিরই প্রত্যক্ষ ফল, একথাও সহজেই বলা চলে।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম্ম।" তাঁর মতে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির পারস্পরিক সামঞ্জস্য-পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ এবং চরিতার্থতায় মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তাই ধর্ম্ম।

যে অনবদ্য বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও বুঝি তার তুলনা বিরল (বঙ্কিমচন্দ্রের মূল প্রেরণা যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তা তিনি স্বীকার করেছেন)। বাংলাদেশের সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যদি অত যুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন না হতেন বা তাঁর মানসিক ভারসাম্যের কিছুমাত্র অভাব ঘটত তবে তাঁর এই মতবাদকে কেন্দ্র করে একদল শিষ্যসামন্ত জুটে যে তাঁকে আর এক শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা অনুকূল ঠাকুর করে তুলত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিষ্য জোটানোর দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ বা প্রশ্রয় ছিল বলে বোধ হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম হিসাবে প্রচলিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই ; কারণ, তাঁর আলোচনা বিশ্লেষণনির্ভর, বিশ্বাসসম্বল নয়। ধর্ম্মের ভিত্তিই হল বিশ্বাস বা 'অলৌকিকে বিশ্বাস'। কিন্তু অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্ম্মের শেষ কথা নয়। বিশ্বাস শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস গোষ্ঠিগত বিশ্বাসের সমার্থক না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুধুমাত্র অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্ম্মের পর্যায়ে পড়ে না। ধর্ম্মের সংজ্ঞায় সামাজিক দিক অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন তাতে এই দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিক মাত্র। তা দর্শনের

এক্তিয়ারভুক্ত। আমাদের আলোচনা যথাসম্ভব সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ রাখব।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা সকলেই ধর্ম্ম নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং যুগের প্রভাবে ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিকটাই প্রায় সকলের চোখেই প্রধান হয়ে উঠেছে। কাণ্টের মতে "Religion is morality", ফিক্তে বলেছেন "Religion is knowledge"। হেগেলের মতে আবার "Religion is or ought to be perfect freedom, for it is neither more nor less than the devine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit." এই শতাব্দীর চিন্তাধারায় ব্যক্তিবাদের সর্ব্বাত্মক ব্যাপ্তি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও অনেকাংশেই আচ্ছন্ন করে ছিল, তাই এ-যুগের বিচারে ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিকটাই প্রধান। একমাত্র আগস্ত কোঁতেই ধর্ম্মের সামাজিক দিক সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে—"Religion consists in regulating one's individual nature and forms the rallying point for all the separate individuals."

তবু, গোষ্ঠিগত অলৌকিকে বিশ্বাস বললেই ধর্ম্মের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না, কারণ ধর্ম্ম ক্রিয়ামূলক। প্রত্যেক ধর্ম্মের সঙ্গেই আনুষঙ্গিক পূজাপ্রকরণ বা আচার-অনুষ্ঠান অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার সূত্রপাত যে অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস বা ভয় থেকে' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আদিমানবের ধারণায় জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্যের ফলন—এক কথায় মানবিক বা প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাই কোন না কোন শক্তির প্রভাবে সংঘটিত। সেই সব শক্তি আকাশ, নদী, পাহাড় বন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পাথর, এমনকি বিভিন্ন পশু-পাখীর মধ্যেও কল্পনা করা হ'ত। সেকালে মানুষের চোখে সমস্ত পদার্থই সচেতন

এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন (এই ধারণা এবং তজ্জনিত মতবাদকেই Animism বা সর্বপ্রাণবাদ আখ্যা দেওয়া হয়)। কাজেই সেই সমস্ত শক্তিকে নৈবেদ্য সহযোগে ভজনায় তুষ্ট করে অথবা ভীতি প্রদর্শনে বাধ্য করা যায় বলেই সে কালের ধারণা ছিল। সেই ধারণার বশে যে সব ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল, পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান তারই পরিণতি মাত্র। ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থায় তা ইন্দ্রজালমূলক যৌথ অনুষ্ঠানের বেশী কিছু ছিল না। তাই James Frazer-এর মতে ধর্ম্মের সংজ্ঞা হল "A propitiation or conciliation of powers superior to men which are believed to control the course or nature of human life"।[১] অবশ্য এ সংজ্ঞাও যে অসম্পূর্ণ তা আমাদের আলোচনার সূত্রে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। যাই হোক, প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্ম্ম একান্তই ক্রিয়ামূলক, ভাবমূলক নয়। ধর্ম্মে ভাবপ্রাধান্য একান্তই আধুনিক এবং এখনও কোন ধর্ম্মই অনুষ্ঠানবর্জিত নয়।

ধর্ম্মের এই ক্রিয়ামূলক দিক আবার ধর্ম্মের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হ'ল অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য। ধর্ম্মের ঐন্দ্রজালিক পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত সমাজেই এমন কয়েকজন ব্যক্তির সন্ধান মেলে যারা কতকগুলি অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা প্রবণতার পরিচয় দেয়। প্রচলিত অন্য কোন উপযুক্ত শব্দের অভাবে আমরা এদের ঐশীশক্তিসম্পন্ন (Charismatic) ব্যক্তি বলব। আদিম সমাজে এদের প্রতিপত্তি যে খুবই বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাদের ছাড়াও অনেকে আবার অসাধারণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং ধীশক্তির বলে মানুষের এবং মনুষ্য পালিত পশুর রোগের নিরাময়

---

(১) ইন্দ্রজাল এবং ধর্ম্মের সম্পর্ক বিষয়ে James Frazer-এর Golden Bough গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। বলা বাহুল্য, সমাজতত্ত্বে ইন্দ্রজাল মানে ভেল্কিবাজী নয়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রজাল বলতে আমরা মোটামুটিভাবে বশীকরণকৌশলই বুঝব।

করতে অনেক সময় সফল হ'ত। আদি মানব সমাজে এই দুই জাতীয় লোকেরই স্থান যে খুব উচ্চে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাথমিকযুগের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার যৌথরূপ যাই থাকুক সেই সব অনুষ্ঠানাদির নেতৃত্ব যে এদেরই হাতে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরোহিত শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটেছে এইভাবেই। আগেই বলা হয়েছে, অলৌকিকশক্তি সম্বন্ধে ভয় ও ভক্তি দুইভাবই লোকের মনে প্রবল ছিল। কাজেই অলৌকিকের সঙ্গে কারবারে সাধারণ লোকে নিজেরা হস্তক্ষেপ না করে এই গুণিন শ্রেণীবিশেষের হাতেই পূজার্চনার পবিত্র ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করত। এই গুণিন শ্রেণীও যে তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য কায়েমী করার এই বন্দোবস্তে কোনরূপ অসহযোগিতা করেননি তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পবিত্র' ক্রিয়াকলাপে ক্রমশঃ জনসাধারণের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং এভাবে পুরোহিতদের একচেটিয়া ব্যবসায় সমাজে সুদৃঢ় স্বীকৃতি পায়। আজ পৌরোহিত্য ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অলৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে পুরোহিতশ্রেণীর নেতৃত্বে অলৌকিক শক্তির উপাসনার্থে গোষ্ঠিগত ক্রিয়াকলাপ যখন সাংগঠনিক রূপ পায় তখনই তাকে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। সংগঠনও ধর্ম্মের আবশ্যিক অঙ্গ।[২] পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতীক চার্চ (Church)। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমাজ-জীবনের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে দেবালয়কে ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতীক হিসাবে খাড়া করার প্রশ্নই ওঠে নি। সামাজিক সংগঠনই ধর্ম্মীয় সংগঠনের প্রতিভূ হয়েছে। অতএব ভারতবর্ষেও ধর্ম্মের সাংগঠনিক দিক অস্বীকৃত বা উপেক্ষিত, একথা বলা চলে না। ধর্ম্মের এই অপরিহার্য দিকগুলি বিচার করে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আমরা

---

(২) Cf. Emile Durkheim. "Elementary forms of religious life" tr. by J. W. Swain, London 1915. p 47.

এইভাবে নির্দ্ধারিত করব—অলৌকিকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পূরোহিত শ্রেণীর নেতৃত্বে অলৌকিক শক্তির উপাসনার জন্য কোন জনগোষ্ঠীর যে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে ওঠে তাই ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য, সংগঠন মানেই তার সঙ্গে কতকগুলি নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের সঙ্গেই তাই কতকগুলি নৈতিক অনুশাসন (moral codes) অপরিহার্যভাবে জড়িত, এবং সমস্ত ধর্ম্মেই এই নৈতিক অনুশাসনাবলীর গুরুত্ব খুব বেশী।

কি টোটেমিক যৌথজীবনে, কি বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে, ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব। টোটেমিক বন্ধনে ধর্ম্ম যেমন সিমেন্টের কাজ করেছে, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সূত্রপাতে তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উস্কে দিয়ে প্রগতির পথ পরিষ্কার করেছে।[৩] সমস্ত যুগেই অলৌকিকের বিশ্বাস ও ভীতি, স্বর্গের প্রলোভন বা নরকের বিভীষিকা, এবং ধর্ম্মীয় অনু-শাসন সমাজের শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং ভারসাম্য বজায় রেখেছে, সামাজিক কল্যাণে যার অবদান মোটেই তুচ্ছ নয়। তা'ছাড়া বিশ্বাস সাধারণ মানুষের পক্ষে চিরদিনই একান্ত অবলম্বন। বর্ত্তমানে ধর্ম্মীয় বিশ্বাস হয়ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু মূলতঃ উভয়ের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। পৃথিবীর এক বিপুল জনসমষ্টি, সম্ভবতঃ অধিকাংশের পক্ষেই, ধর্ম্ম যে এখনও একটি মহৎ অবলম্বন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথাও বলা প্রয়োজন যে সেই বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ম্মের সাংগঠনিক দিকের যোগ নেই। এই বিশ্বাস ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিকমাত্র।

---

(৩) প্রোটেস্টান্ট মতবাদের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিকাশের নিবিড় যোগাযোগের কথা Max Waber অকাট্য যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে প্রমাণিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর "The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism" (tr. by T. Parsons. New york 1930) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মের এই মূল্যবান অবদানের উল্টোদিকে তার অপকারিতার পাল্লাও ভারী। অতীতে অন্ধবিশ্বাস এবং অজ্ঞানতার ফলে যে সব ধর্ম্মীয় অনুশাসনের সৃষ্টি হয়েছে তাদের উপকারিতার চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপকারিতাই বেশী। নরবলি, কন্যাবিসর্জ্জন, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, ধর্ম্মের নামে বেশ্যাবৃত্তি, প্রয়োজনীয় খাদ্য নিষিদ্ধ (বা 'উৎসর্গ') করা এবং আরো অসংখ্য কুসংস্কার সমাজের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক হয়নি। এ সবই চলেছে ধর্ম্মের নামে। প্রগতিশীল ভাবধারা বা কার্য্যকলাপ চিরদিনই ধর্ম্মের বিরোধিতায় বাধাহত হয়েছে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য এই সমস্ত প্রতি-ক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ধর্ম্মের নামে চললেও ধর্ম্মকে সেজন্য দায়ী করা চলে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট থাকলে এসবের জন্য সরাসরিভাবে না হ'লেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে ধর্ম্মকে দায়ী করা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ধর্ম্মের প্রকৃতি স্থৈতিক (static) এবং রক্ষণশীল। প্রচলিত ধর্ম্মব্যবস্থার বিধি-বিধানের সঙ্গে গতিশীল (dynamic) সামাজিক প্রয়োজনীয়তার অসঙ্গতি অনেক সময়ই তীব্র হয়ে দেখা দেয়। (সেই অসঙ্গতি হয়ত নূতন ধর্ম্মের সূচনা করে, কিন্তু সেই সূচনা যতদিন পর্যন্ত না সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়ে সাংগঠনিক রূপ দেয় ততদিন পর্য্যন্ত তা ধর্ম্মের পর্যায়ে পড়ে না। ততদিনে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতি হয়ত নবতর অসঙ্গতির সূত্রপাত করবে।) ধর্ম্মকে তাই ইতিহাসে চিরদিন রক্ষণশীল ভূমিকাতেই দেখা গেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং ন্যায়নীতির রক্ষণাবেক্ষণ করাই ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। শাসকশ্রেণীর পক্ষে ধর্ম্ম তাই চিরদিনই প্রধান সহায়।

উপকার অপকারের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় ধর্ম্মের যা মূল ভিত্তি, সেই অলৌকিকে বিশ্বাসই টলে উঠেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে এমন অনেক ঘটনা

বা পরিস্থিতি মানুষের বোধগম্য হয়েছে যা আগে অলৌকিকের পর্যায়ে জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বলে ধরা হত। তার ফলে আবার যা এখন পর্যন্ত বোধগম্য হয়নি তাও ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তে আসবে, এ আস্থার সঞ্চার হয়েছে। এদিকে সামাজিক অসাম্য প্রভৃতি নানা কারণেও 'ভগবানের' উপর মানুষের বিশ্বাস বহুলাংশে সঙ্কুচিত। তদুপরি বিজ্ঞানের কল্পনাতীত সাফল্য ঈশ্বরমুখী মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলেছে। যতবড় বিশ্বাসীই হোন না কেন, রুগ্ন সন্তানকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভরসায় ফেলে না রেখে সকলেই আধুনিক ডাক্তারকে ডাকেন। ডাক্তার হাল ছেড়ে দিলে তবে চরণামৃতের খোঁজ পড়ে।

ধর্ম্মের মূল ভিত্তি শিথিল হবার ফলে পূজা অর্চ্চনার বিভিন্ন ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে; যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় আবার পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। আজ মোটামুটিভাবে ধর্ম্মেরই সার্থকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার এই ঘাটতি পুরণের জন্যই আধুনিক যুগে সমস্ত ধর্ম্মেই মানবকল্যাণ বা সমাজসেবার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা মিশনারীদের সেবামূলক কার্যকলাপ তারই সাধারণ উদাহরণ মাত্র।

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা যদি শেষ পর্যন্ত সমাজকল্যাণেই পর্যবসিত হয়, তবে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে যে সব ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীয় সংগঠন আছে, তার কোন সার্থকতা থাকে না। এ যুগে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান, সকলেরই লক্ষ্য সমাজকল্যাণ। শুধুমাত্র ধর্ম্মীয় বলেই কোন সংগঠন সমাজকল্যাণে বেশী কার্যকরী হবে একথা মেনে নেওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর চেতনায় তাই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান বলে আত্মসনাক্তি অর্থহীন অন্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সমাপ্ত